মহান স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

মার্চ ২০১৭ ▪ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৩

সচিত্র বাংলাদেশ

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১৭ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা

মহান মুক্তিযুদ্ধে নৃশংস গণহত্যা

৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 9 March 2017, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

মার্চ ২০১৭ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৩

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাঙালির জাতীয় জীবনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। এই মহান স্বাধীনতা অর্জনের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। '৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট নির্দেশনা– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণ বিসর্জন, ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম এবং অগণিত মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। এ দিনে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের অগণিত শহিদকে। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র এবং ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি এবারের সংখ্যায় ছাপা হলো। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এর উপর নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যায়।

এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত বিষয় স্থান পেয়েছে। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জিব কুমার সরকার

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুবর্ণা শীল
নাহ্‌রীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহকারী
মো. জাকির হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ০২-৯৩৩৩১২০, ০২-৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৪

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ৫

স্বাধীনতা আমাদের পরিপূর্ণতার প্রেরণা ৮
সোহরাব আহমেদ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ১২
খালেক বিন জয়েনউদদীন

ইসলামের ইতিহাসে ইনশাআল্লাহ এবং ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ১৫
ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান

স্বাধীনতার ৪৬তম বার্ষিকীতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ১৭
ড. আতিউর রহমান

মহান মুক্তিযুদ্ধে নৃশংস গণহত্যা ২০
নাজনীন সুলতানা নীতি

ঢাকা মহানগরীর পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ২২
আবু নাছের টিপু

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন ২৫
জেআর লিপি

নারীর উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভূমিকা ২৮
কমল চৌধুরী

কিশোর কবিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৩০
উৎপলকান্তি বড়ুয়া

বাংলা চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর ৩৫
আপন চৌধুরী

গল্প

বৈপরীত্য ৩৭
ফকির জসীমউদ্দিন

ধারাবাহিক উপন্যাস

ভ্রষ্ট বিলাস ৪০
সাগরিকা নাসরিন

কবিতাগুচ্ছ

৪২-৪৫

সোহরাব পাশা, আলম তালুকদার, গোলাম নবী পান্না, শাফিকুর রাহী, লিলি হক, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, কনক চৌধুরী, কালী রঞ্জন বর্মণ, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, লিটন ঘোষ জয়, এমদাদ শুভ্র, সোহেল বীর, বাবুল তালুকদার, বাপ্পি সাহা, কামাল বারি, আবেদীন বাপ্পী, রোকসানা গুলশান, নাহিদ মিশকাত

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৬
তথ্যমন্ত্রী ৪৮
আমাদের স্বাধীনতা ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৫০
উন্নয়ন ৫২
জেন্ডার ও নারী ৫৩
শিক্ষা ৫৪
প্রতিবন্ধী ৫৪
স্বাস্থ্যকথা ৫৫
সংস্কৃতি ৫৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৭
কৃষি ৫৮
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫৯
যোগাযোগ ৫৯
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
চলচ্চিত্র ৬০
সামাজিক নিরাপত্তা ৬১
নিরাপদ সড়ক ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
শিল্প-বাণিজ্য ৬৩
আন্তর্জাতিক ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb@yahoo.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

ইসলামের ইতিহাসে ইনশাআল্লাহ এবং ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ইসলামের সুরক্ষার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানিদের জুলুম, নির্যাতন ও গোয়ার্তুমির জন্য সে পাকিস্তান ভাঙতে বসেছে। এমন অবস্থায় যখন ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ' তখন সকল সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু এ কঠিন সমরে আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছেন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১৫।

মহান মুক্তিযুদ্ধে নৃশংস গণহত্যা

২৫ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। সেই একরাতেই প্রায় ৭ হাজার নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। ১৯৭১-এর এপ্রিল এবং মে মাসে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়। এসময় হানাদারবাহিনীর করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে এদেশের মানুষ দিকভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। প্রায় ১ কোটি মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। লক্ষ লক্ষ মা-বোন গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন। লুণ্ঠিত হয় বহু মূল্যবান সম্পদ। এর উপরে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন, পৃষ্ঠা-২০।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা

বাঙালির প্রিয় মানুষ, প্রিয়জন এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জন্মদিন বাঙালির কাছে পরম প্রাপ্তি ও খুশির দিন। দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হলেও দিনের আনন্দ-উৎসবের অংশীদার জাতির সর্ব শ্রেণির মানুষ। এদিন শিশুরা আনন্দ-খুশির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেনে নেয়–এই মহান মানুষটির কারণেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শিশুদের ভীষণ ভালোবাসতেন। শিশুরা স্বাধীন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করবে–এমন স্বপ্ন দেখতেন কৈশোর ও যুবা বয়সে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১২।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিনে সারাবিশ্বে উচ্চারিত হয় নারীদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের বাণী। আলোচনা হয় নারী-পুরুষ সমতা ও নারী মুক্তি প্রসঙ্গ। নারী নেতৃত্ব বা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রশাসনের সর্ব পর্যায়ে সগৌরব উপস্থিতিই বলে দেয় তাদের অবস্থান এখন কতটা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে তার বড়ো উদাহরণ বিশ্বখ্যাত *টাইম* ম্যাগাজিনের বিশ্বসেরা ১০ নারী নেত্রীর তালিকায় এবং পর পর কয়েকবার ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্থান লাভ। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-২৫।

Declaration of Independence

'THIS MAY BE MY LAST MESSAGE, FROM TODAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL UPON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE, TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR FIGHT MUST GO ON UNTIL THE LAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH AND FINAL VICTORY IS ACHIEVED.'

[Message embodying declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March, i.e. early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

Source: Bangabandhu Speaks, A Government Publication, 1972 (BGP-71/72-2787F-3M)

স্বাধীনতার ঘোষণা

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

সূত্র : বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০১২

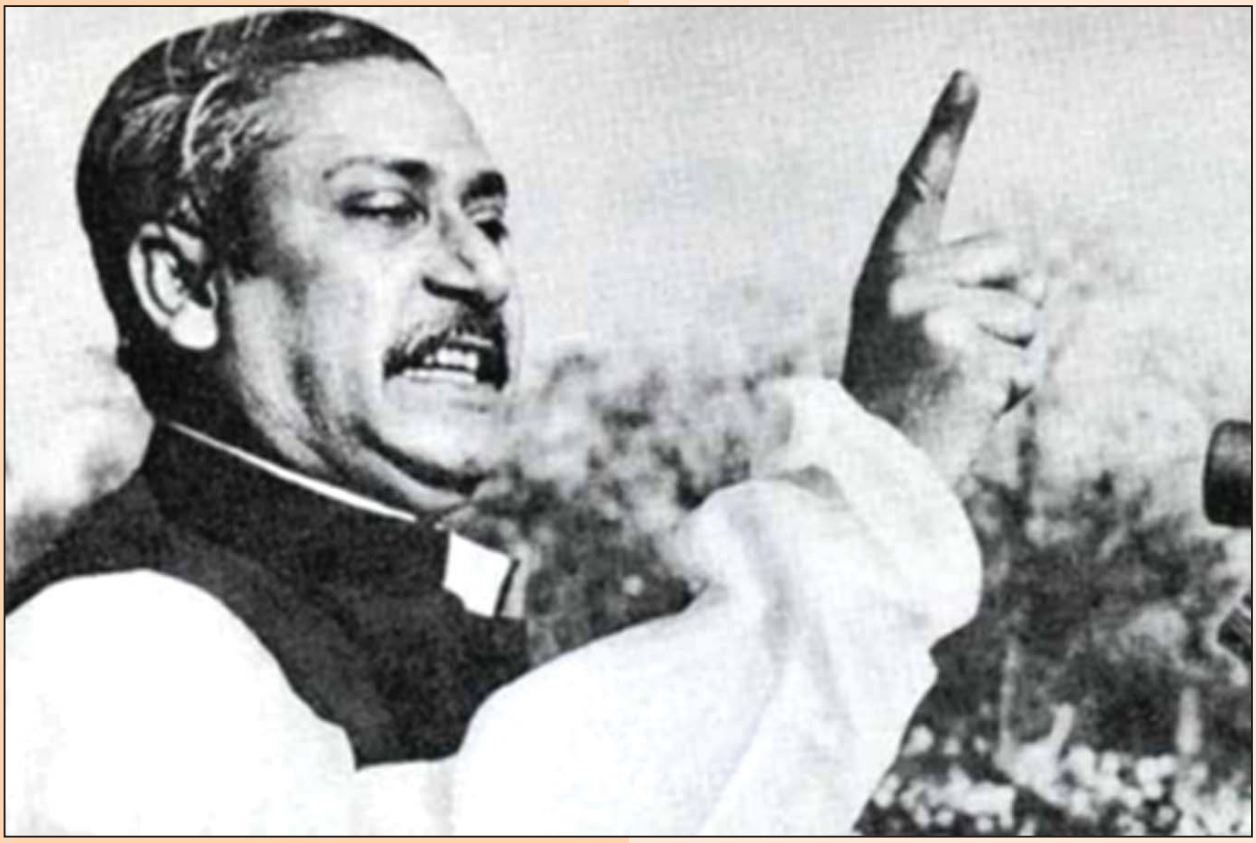

৭ মার্চ ১৯৭১, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ভায়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম? *(আপনারা)* নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে *(আপনারা)* ভোট দেন। আমরা ভোট পাই। আমরা দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলায় অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো–আপনারা জানেন। দোষ কি আমাদের ? *(আজকে তিনি)* আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা জানেন, আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে, তিনি মেনে নিলেন *(মেনে নিলেন)*। *(তিনি)* তারপরে আমরা বললাম, ঠিক আছে– আমরা এসেমব্লিতে বসবো, আমরা আলোচনা করবো। আমি বললাম– বক্তৃতার মধ্যে, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতা নিয়াজী খানের সঙ্গে আলাপ হলো, মুফতি বালুচ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলাম– আসুন, বসি। জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে ছয় দফা-এগার দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে, এটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা আসুন, বসুন, আমরা *(আমরা)* আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে

তাহলে *(আমাদের)* আমাদের ওপরে তিনি দোষ দিলেন, এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরও যদি কেউ আসে তাকে ছন্নছাড়া *(ছন্নছাড়)* করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে– যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না। তারপরে বন্ধ করে দেওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল, আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমাদের *(যাদের)* অস্ত্র নাই *(আমাদের হাতে)*, জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিবদুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে– তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এ দেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই, আমি বলেছি তাদের কাছে এ কথা, যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, তা থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।

তারপরে উনি বললেন *(যে আমার নামে বলেছেন)*, আমি নাকি *(বলে)* স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে এ কথা বলে দেবার চাই– আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়, তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে, কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তারপরে আপনি ঠিক করুন– আমি এই কথা বলেছিলাম।

তিনি বললেন, (*আমি নাকি তাকে*) তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন (*নাকি*) যে আমি আরটিসিতে বসব। আমি তো অনেক আগে বলেছি যে কীসের আরটিসি, কার আরটিসি, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? আপনি আসুন, দেখুন, জাতীয় পরিষদের জন্য আমার লোকেরা রক্ত দিয়েছে। (*সত্য কথা ... তারপরে আজকে আজকে আমার যখন ... এসেমব্লি ... এসেমব্লি দেবেন ... তিনি ২৫ তারিখে এসেমব্লি ... এরপরে আপনারা জানেন, আমি কলাম, আমি কলাম ... পল্টন ময়দানে ... আমি বললাম, সবকিছু বন্ধ ... আমি বললাম, সবকিছু বন্ধ, সরকারি অফিস বন্ধ, ... আমি বললাম, ... আমার কথা তারা মানলো, তখন আমাকে বলল, এই আপনারা আমাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আপনারা আমি বললাম, কোনো সরকারি অফিস চলবে না। কোনো কিছু চলবে না। তবে কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হবে, আমি ডিসকাস করলাম যে, এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেইভাবে চলল।*)*

আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেমব্লি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের। (*উনি .... দিলেন ... রাষ্ট্র কার ....?*) গোলমাল হলো উনার পশ্চিম পাকিস্তানে, গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে।

আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভায়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে এসে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসা, (*আমরা*) এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।

ভায়েরা আমার,

(*তোমরা*) আমার ওপর বিশ্বাস আছে? (*... জনতার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ...*) আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব– আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের– গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেই জন্য সমস্ত অন্যান্য যে যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল– কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে– শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, (*তারপর আর কী?*) সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা– কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়– তোমাদের (*উপর*) কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি– তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগ অফিসে রিলিফ

** এখানে বন্ধনীভুক্ত অংশটুকু বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট হওয়ায় টেক্সট থেকে বাদ দেওয়া হলো।*

৭ মার্চ ১৯৭১ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, অন্য যারা এজন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন, মনে রাখবেন। আর সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্টে বা জজকোর্টে দেখা না হয়। দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো– কেউ দেবে না।

আপনারা আমার ওপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কী করে করতে হয়। শোনেন, মনে রাখবেন, একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, পাইক ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়– মনে রাখবেন।

দ্বিতীয় কথা হলো এই– যদি আবার কোনো রকমের কোনো আঘাত আসে, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে, মনে রাখবেন– একটা কথা অনুরোধ করছি, (*এটা অত্যন্ত শক্ত কথা এই যে, কিন্তু*) সামরিক বাহিনীর লোকেরা কোনো জায়গা থেকে অনর্থক ঘোরাফেরার চেষ্টা করবেন না। তাহলে দুর্ঘটনা হলে আমি দায়ী হব না।

প্রোগ্রামটা বলছি আমি, শোনেন। রেডিও, টেলিভিশন, নিউজ পেপার– মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা– যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। (*রেডিওতে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। টেলিভিশনে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।*) দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নেবার পারে, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাস হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন, আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ভায়েরা আমার,

(*আমার কাছে*) এখন শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে, (*এই–*) আপনারা আমার এইগুলি চালায়ে দেন, কারো হুকুম মানতে পারবেন না। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না, জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।

দ্বিতীয় কথা– প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

সূত্র : বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০১২

[বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসের অসামান্য ও অপরিহার্য এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভাষণটি বিভিন্ন গ্রন্থে ও রেকর্ডে অপূর্ণাঙ্গ ও অবিন্যস্তভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২০১২ সালে 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ' গ্রন্থে ভাষণটির একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও পূর্বে প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপিবিহীন এ ভাষণের দু'একটি স্থানে কোনো কোনো শব্দে অথ বা শব্দগুচ্ছে, বাক্যাংশে অথবা বাক্যে পুনরুক্তি থাকায় সাধারণভাবে পুনরুক্ত অংশ বাদ দিয়ে তখন সম্পাদনা করা হয়। তবে যথাসম্ভব অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ কলেবরে ভাষণটি উপস্থাপনের স্বার্থে মূল টেকস্ট থেকে সম্পাদনার জন্য বাদ দেওয়া অংশটি বাঁকা অক্ষরে ব্রাকেটবন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে – যাতে করে পাঠক ও গবেষকেরা ভাষণটির অবিকল পাঠের সুযোগ লাভ থেকেও বঞ্চিত না হন। – সম্পাদক]

নিবন্ধ

স্বাধীনতা আমাদের পরিপূর্ণতার প্রেরণা

সোহরাব আহমেদ

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়॥

না, কেউই দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরতে চায় না। অধীনতা স্বীকার করতে চায় না। ব্যক্তি জীবনে নিজের ইচ্ছেমতো বাধাহীনভাবে চলার অধিকারকে আমরা বলি ব্যক্তি স্বাধীনতা আর জাতীয় জীবনে অন্য জাতির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে জীবনযাপন করার অধিকারকে বলে জাতীয় স্বাধীনতা। আমাদের বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে আমাদের দেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করে। সেজন্যই এ দিনটি আমাদের বড়োই আনন্দের ও গৌরবের। কবি শেখ ফজলুল করিম বলেছেন–

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে
সুখের আলো জ্বালে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি, খোদার সুধা দান
স্পর্শে তাহার নেচে ওঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
দর্প ভরে পদানত উচ্চ করে শির
শক্তিহীনের স্বাধীনতা আখ্যা দানে বীর।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বে এ ভূখণ্ড প্রায় দুইশ বছর ইংরেজ শাসনের অধীনে ছিল। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি ইংরেজ এদেশ থেকে বিদায় নিলেও বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসনের অধীনে এল। পাকিস্তানি শাসকেরা ধর্মের নামে এই দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালির ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চলছিল ষড়যন্ত্র। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, শফিক এবং আরো অনেকের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা। তারপর ১৯৬৭ সালে ঐতিহাসিক '৬ দফা' দাবি উত্থাপিত হয়। ৬ দফা মূলত আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি হলেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী একে মেনে নিতে পারেনি। শুরু হয় সারাদেশে ধরপাকড়। দেশের নেতৃবৃন্দকে জেলে আটকে রাখা হলো। তখন শুরু হয় ছাত্রসমাজের ১১ দফা আন্দোলন। দেশের জনগণের ও ছাত্রদের যৌথ আন্দোলনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাঙালি যেমনি শান্তিপ্রিয় জাতি তেমনি বীরও।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে নাচাই নাগেরি মাথায় নাচি।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ মার্চ ২০১৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সূর্যোদয়ের সময় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন – পিআইডি

আমরা সেই জাতি। পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন দিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না। পরিবর্তে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রিতে শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র বাঙালির উপর লেলিয়ে দেয় সেনাবাহিনী। গুলি আর বোমার গর্জনে কেঁপে ওঠে সারাদেশ। পৃথিবীতে এমন বিশ্বাসঘাতকতার নজির বিরল। সারাদেশে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন।

স্বাধীনতা কখনই সহজলভ্য নয়। কেউ কাউকে স্বাধীনতা দেয় না, তাকে ছিনিয়ে নিতে হয়। আমাদের জন্যও এই স্বাধীনতা অর্জন ছিল অত্যন্ত কঠিন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার সরকার। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের নির্দেশে জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর পরিচালনায় রক্তক্ষয়ী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ মার্চ ২০১৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশে শিশুদের শারীরিক কসরত প্রত্যক্ষ করেন –পিআইডি

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিসংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এ ঘটনাপঞ্জি অনুসারেই প্রতিবছর ২৬ মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ইংরেজদের কাছে পরাজয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব, ১৯২৯ সালে সূর্যসেনের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যদিয়ে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু। অবিভক্ত ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়াই করেছি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, তারপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়াই করেছি ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতার সূর্য আমরা ছিনিয়ে এনেছি ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে।

প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে স্বাধীনতা দিবস আমাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়। স্বাধীনতা দিবস আমাদের প্রেরণা দেয় সংগ্রামের এবং কর্তব্যের। এ দিন সরকারি ছুটি। সরকারি ও বেসরকারি প্রত্যেক ভবনের শীর্ষে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়। এ দিন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচি, বিভাগীয় শহরের স্টেডিয়ামে শিশু সমাবেশ, সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ, শহিদমিনারে ও সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য দেওয়া হয়। মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। তাছাড়া সারা বাংলায় বিজয় মিছিল, বিজয় মেলা, শোভাযাত্রা, খেলাধুলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। কারণ, স্বাধীনতা এক অমূল্য সম্পদ। মীর মশাররফ হোসেনের ভাষায় বলা যায়, 'রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতা ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও সে মহামূল্য রত্ন আর হস্তগত হয় না। স্বাধীনতার সূর্য একবার অস্তমিত হইলে তাহার পুনরুদ্ধার হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা'।

আধুনিক কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝানো মিছিল
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।

স্বাধীনতা মানে কৃষক, মজুর, ছাত্র, জনতা সবার স্বাধীনতা। মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা লাভ করা যতটা কঠিন, তাকে রক্ষা করা তার চাইতে কম কঠিন নয়।

মানুষের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্থবহ হতে পারে। স্বাধীনতা দিবস তাই আমাদের অন্ধকার জীবনে আলোর দীক্ষা, দুঃখের অমানিশায় সুখের সূর্যোদয়। স্বাধীনতা দিবস শুধু লাল রঙে রঞ্জিত পঞ্জিকার তারিখ বা উৎসবের দিন নয়– এটি আমাদের পরিপূর্ণতার প্রেরণা। স্বাধীনতা আশ্চর্য এক চেতনার নাম তাই–

স্বাধীনতা হে স্বাধীনতা
আমার প্রতিটি রক্তকণায়
এক উজ্জ্বল অনুভূতি।

মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা হাতে জনতার উল্লাস

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

নিবন্ধ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একক দল হিসেবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ। শুরু হলো ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনার নামে নানারকম টালবাহানা আর ষড়যন্ত্র। এরই মধ্যে ৭ মার্চ, ১৯৭১ রমনা রেসকোর্সে লাখো জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন– 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে গ্রেফতারের পূর্বে জাতিকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন। মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পশ্চিম পাকিস্তানের জিন্দানখানায় বন্দি স্থিরপ্রতিজ্ঞ পিতা ক্ষমা চাইলেন না, অনুরোধ করলেন লাশটা বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দিতে। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ হাজার দেড়েক মাইল দূরে মরুভূমির জিন্দানখানা থেকে মুক্ত তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন মুক্ত স্বদেশ ভূমিতে। লন্ডনের *The Suardiaw* পত্রিকা একটিমাত্র বাক্যে ইতিহাসের জবাব দিয়েছিল '*Once Sheikh Mujibur Rahman steps out of Dacca Airport the new Republic becomes a solid fact*' অতঃপর আমরা বুঝে নেওয়ার প্রয়াস পাব। প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করতে চাই: 'আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মলা আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সব বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।' সঙ্গে যোগ করে নিই: 'ঐ মহামানব আসে/উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব/নব জীবনের আশ্বাসে।' রবীন্দ্র পাঠকদের অবশ্য জানা রয়েছে এই রচনা 'সভ্যতার সংকট' ১৯৪১-এর এপ্রিলে এবং তা বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম এক ঐতিহাসিক কালান্তরের পটভূমিতে। প্রসঙ্গত নিবেদন যে, উপরোক্ত রবীন্দ্রকথনের সঙ্গে কল্পিত কোনো প্রকারের ধারাবাহিকতার যোগসূত্র সন্ধানের মূঢ় অপপ্রয়াসে আমরা ব্রতী হইনি। তবে ভাবতে ভালো লাগে যে, পরবর্তী তিন দশকের কালব্যবধানেই আমাদের জন্য যেন ঐ ইতিহাসের স্বর্ণফসল 'বাংলাদেশ' এবং আমাদের মাঝে এক মহান মানুষ এসেছিলেন। বহমান হাজার বছরের বাংলায় এই প্রথম স্বাধীন জাতির জন্ম এবং পিতা তিনি নবজাতকের।

পূর্ববর্ণিত অনুসন্ধিৎসার জবাব সন্ধান প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বলছি জাতির পিতা। এইখানে সরল জিজ্ঞাসা: তিথি নক্ষত্রের যোগে হঠাৎ করেই তিনি এক প্রভাতে আবির্ভূত হয়ে গেলেন এবং উচ্চারণ করলেন এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। বাস্তবের ভুবনে এমনটি কুহকের অধিক নয়। সেই তাকে কিন্তু হয়ে হয়ে উঠতে হয়। কেমন করে? প্রবহমান কালের সঙ্গে, আপন মানুষের সঙ্গে অঙ্গে-আত্মায় মিশে গিয়ে, সত্যের বিশ্বাসে মরণপণ কমিটমেন্ট নিয়ে এবং দীর্ঘ দুর্গমতার জঙ্গম-সড়ক পাড়ি দিয়ে তবে পিতা 'সেই তিনি' এবং ইতোমধ্যে স্বদেশবাসী আম-মানুষের অন্তরে তাঁর জন্য ভালোবাসার শ্রদ্ধার ঠাঁই। লড়াইয়ের কালে আগ্রাসী গণশত্রুর মোকাবিলায় তিনি নির্দেশনা দেন। তিনি নির্মিত হয়ে যান এবং শেষাবধি আমরা সুস্পষ্ট জেনে যাই আপন পিতাকে। ইতিহাসের পালাবদলে আমাদের জন্য যখন সেই মহত্তম অর্জন 'বাংলা' নামে দেশ, আর বাসিন্দা জয়ী মানুষেরা আত্মপরিচিতিতে 'বাঙালি', বিস্ময় কী যে বারংবার আসবে পিতার কথা। বিশেষ করে আপন ঘরের বংশধর তাদের জন্য। বিবেচনা করি যে, সবটা মিলিয়ে বড়োই জরুরি এই কাজ। সেই সময়টায় ছিলেন একজন, জন্মসূত্রে শেখ বংশের সন্তান, নাম শেখ মুজিবুর রহমান; পিতা শেখ লুৎফুর রহমান, মাতা সায়রা বেগম; সাকিন টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর। লক্ষ করা যাবে যে, আরো লক্ষ হাজার জনের তালিকায় কোনো এক সাধারণ ঐ নাম, আর ঠিকানাও তেমনি কোনো এক গৈ-গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। বাইরের কে রাখে সে খোঁজ। তবে এমনই তো ঘটে থাকে। কোথা থেকে যেন ইতিহাস সূর্যকরোজ্জ্বলে আলোক চিহ্নিত করে তোলে। ভবিষ্যতে তখন তা তীর্থক্ষেত্র। এমন করে এখন বলব ১৯২০-এ মার্চ ১৭-তে

১৯৬২ সালে পথসভায় ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আন্ধারের মফস্বল ঘরে জন্মেছিল সেই শিশু, আর বছর পঞ্চাশের ব্যবধানে ১৯৭১ জুড়ে দেখছি বিশ্ব মিডিয়াতে হেডলাইনে সর্বাধিক গুরুত্বে উচ্চারিত দুটি নাম ভিয়েতনামের হো চি মিন এবং আমার বাংলার শেখ মুজিবুর রহমান।

টুঙ্গিপাড়ার শেখ সন্তান আদরের ডাকে ছেলেবেলায় খোকা, তারপর মুজিব ভাই, তারপর বঙ্গবন্ধু, তারপর যখন নব অভ্যুদয় বাংলাদেশের ততদিনে তিনি স্থপতি, জাতির পিতা। নানা বাঁকে বাঁকে সে ইতিহাসের সড়ক এগিয়ে গেছে। আমরা অবলোকন করব, পাঠ করব নিজেদেরকেই আবিষ্কারের তাগিদে। তাতে করে বর্তমানের সংকটকে লড়তে এবং যুগপৎ ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ বাসভূমি নির্মাণে সমর্থ হবো। কদাপি যেন না ভুলি যে, উত্তরাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হয়। সেই হেতুতেই পিতাকে চিনে নেওয়া নিতান্তই ফরজ। বিভাগপূর্ব অখণ্ড বাংলার মহানগরী কলকাতা তখন বেজায় টানত। এতদাঞ্চলের উজ্জ্বলতম জনপদ কলকাতা প্রশাসনের ব্যবসা-বাণিজ্যের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্র, তৎসহ বিদ্যাচর্চার এবং সংস্কৃতিচর্চার রাজধানী কলকাতা। স্বাভাবিক যে, দূরান্তের ঐ টুঙ্গিপাড়া থেকে শেখ মুজিব এসেছিলেন এই কলকাতায়। সন ১৯৪২ বিদ্যার্থী তরুণ ছাত্র মুজিবুর রহমান ভর্তি হলেন ইসলামিয়া কলেজে। আবাস ঠাঁই নিকটের বেকার হোস্টেলে। আমাদের কিন্তু বিস্তারিত জীবনকাহিনি রচনার বাসনা নেই; স্মৃতিচারণাও নয়। বারংবার বলা হচ্ছে, আদপে উদ্দেশ্য সেই তাঁকে অবলোকন করা কেমন করে মুজিব ভাই থেকে 'জয় বাংলা'র জাতির পিতা ইমেজে তাঁর উত্তরণ। অতএব নিশ্চয় নয় ঐ প্রকারের মোটা হিসেব যে, দিনে দিনে বছর গড়িয়ে বছর, উত্তরোত্তর মানুষটির বয়োবৃদ্ধি ঘটছে। জীবরাজ্যের প্রাকৃতিক নিয়ম দৃঢ়তা সাধন করে থাকে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে কথা অন্যতর এবং অনন্যতর। পেছন ফিরে তাকিয়ে অবশ্য জেনে যাচ্ছি সেইখানে কালের এবং ইতিহাসের অনিবার্য ভূমিকা। বিশ্বাস করতে চাই যে, শেষাবধি হতোই এমনটা। এখন তাই খোঁজ নেব কোথায় কোথায় লালন তার, আর কোন সব বিশেষ পটভূমিতে। লক্ষণীয় যে, প্রারম্ভের কালে শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরের দিনগুলোতে ধাত্রী নদীমাতৃক গ্রামবাংলা, সেইখানে খোলামেলা ষড়ঋতুর প্রকৃতি, আর সেখানকার খেটে খাওয়া, মার খাওয়া মানুষেরা; তাদের সমাজ, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, আচার, তাদের আপন ভাষা সংস্কৃতি কোন অলক্ষে সবটাই তো কাজ করে গেছে। ইতিহাসের কালের সন্তান এইভাবে তৃণমূল ভূমি থেকে হয়ে হয়ে উঠেছেন। জানা রয়েছে, পরের পর্যায় প্রধানতই '৪২–'৪৭-এর মেট্রোপলিটন সিটি কলকাতাকে কেন্দ্র করে। সমকালের রাজনীতির কর্মকাণ্ডে উথালপাথাল রাজপথ, ঢেউয়ের টান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল অবধি। বেশ স্মরণে আসছে সারা ভারতব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণবিস্ফোরণ তখন তুঙ্গে। কংগ্রেসের 'কুইট ইন্ডিয়া', মুসলিম লীগের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ওদিকে মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'লাঙল যার জমি তার'–দাবিতে কিষান-অভ্যুত্থান, বোম্বাইতে করাচিতে নৌ বিদ্রোহ আর ছিল সুভাষ বসুর আইএনএ'র 'চলো চলো দিল্লি চলো লাল কিল্লা তোড় দো'। এমনিতর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নানা মাত্রিকতায় ঋদ্ধ ঐ কাল পটভূমিতে তারুণ্যের শেখ মুজিব।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪৮ থেকে '৫২: ভাষা আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বিক্ষোভ, টাঙ্গাইল উপনির্বাচন, ঢাকার রাজপথে ভুখা মিছিল, আওয়ামী লীগ সংগঠন, বেইজিংয়ে বিশ্বশান্তি সম্মেলন, এবং '৫৪তে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন লড়াই, একদার ছাত্রকর্মী ছাত্রনেতা ইতোমধ্যে সার্বক্ষণিক রাজনীতির কর্মী নেতা শেখ মুজিব। প্রতিবাদী লড়াকু শেখ মুজিবের অবয়ব নির্মিত হচ্ছে। এই মতো করে বর্ণনা করা যাক তাঁর মানস-প্রস্তুতির আর কর্মকাণ্ডের উদ্‌বোধন মাতৃভাষার ইজ্জতের দাবিতে আন্দোলন দিয়ে। নিশানা বাংলাদেশ–বাঙালি। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় অবশ্যই আনতে হবে ১৯৫৬-র ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে তাঁর প্রদত্ত ভাষণাংশ: '*Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengla'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own.*' এইখানে বিশেষ লক্ষণীয় ঐ দাবিটি পাকিস্তান নয়, পাকিস্তানের বদলে '*Bengal*' বাংলাদেশ; আসছে বাংলাদেশের আপন 'ইতিহাস-ঐতিহ্যে'র কথা এবং চৌদ্দ বছরের মাথায় তারিখ ১৯৬৯, ৫ ডিসেম্বর শ্রবণ করছি হৃদয়জাত তাঁর বিশ্বাসের উচ্চারণ, 'জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' হবে।' ইতোমধ্যে কী দ্রুততায় গড়িয়ে গেছে ষাটের দশকের রথচক্র। রেখাচিত্রটি এ কম্প্রকারের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টবিরোধী ছাত্রবিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের আন্দোলন, অতঃপর ছয় দফার আন্দোলন এবং '৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান এই পটভূমিতে অগ্নিঝরা ষাটের দশক। এইবার মিলিয়ে নেব সেই যে তিনি, তার আন্তর-সম্পৃক্ততা দেশ কাল মানুষের সঙ্গে। আমরাই সাক্ষ্য, ততদিনে বাঙালিত্বের প্রেরণার আরেক নাম শেখ মুজিব। স্পষ্ট দেখতে পাই '৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দান, গণনায় শুমার অসম্ভব লাখ লাখ মানুষের উত্তাল জমায়েত; দেশের পক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাকে বরণ করে নিল 'বঙ্গবন্ধু' ডাকের ভালোবাসায়। এ যাবৎকালের মুজিব ভাই। শেখ মুজিব নিজেকেই ছাড়িয়ে গেলেন। তেমন করে কি জানান দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তদবধি ইতিহাসই তো কথা কয়ে গেছে তার কণ্ঠে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক

নিবন্ধ

১৭ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চ। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের এদিন তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বনেদি শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ইরাক থেকে আগত সুফি-দরবেশ শেখ আউয়ালের বংশধর। তিনি শেখ আউয়ালের অষ্টম উত্তরসূরি। এ বছর বঙ্গবন্ধুর ৯৭ তম জন্মদিন। আগামী ২০২০ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান ও বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ অবলোকন করতে পারব।

জন্মক্ষণ বা জন্মদিন পারিবারিকভাবে অবশ্যই স্মরণীয়। শুধু স্মরণীয়ই নয়, আনন্দপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের মুসলিম সমাজে জন্মক্ষণে প্রথমে আজান দিয়ে নতুন সৃষ্টিকে অভিবাদন জানানো হয়। পরে ব্যবস্থা করা হয় আকিকার। হিন্দু সমাজেও ছয়ষষ্টি পালন করা হয়। অন্য ধর্মেও জন্মদিনকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক বিশ্বে জন্মদিন পালন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। জন্মদিনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের এই রীতি বা রেওয়াজ কখনো পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেখা যায়, যদি জন্মদিনের ঐ ব্যক্তি সর্বজনপ্রিয় হন। তখন খুশির সাম্পানে চড়ে প্রিয় ব্যক্তির জন্মদিন বা জন্ম সনকে অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়। আমাদের উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানাদি দৃষ্ট হয়। যেমন ভারতের মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের জন্মদিন সেসব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণীয়। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র তাঁদের জন্মদিনকে আনন্দ-খুশির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ সকল রাষ্ট্র তাঁদের স্মরণীয়-বরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছরই জন্মদিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

বাঙালির প্রিয় মানুষ, প্রিয়জন এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ইতিহাসের কিংবদন্তি মহাপুরুষ। তিনি পাকিস্তানের নিগড় ভেঙে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের স্বরাজ এনে দিয়েছেন। তাঁর সারাজীবনের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। বাঙালির হৃদয়জোড়া তাঁর পথ, যশ ও খ্যাতি। তাইতো কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন:

ধন্য সেই পুরুষ
যাঁর নামের উপর পতাকার মতো দুলতে থাকে স্বাধীনতা
ধন্য সেই পুরুষ
যাঁর নামের উপর ঝরে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।

তাঁর জন্মদিন বাঙালির কাছে পরম প্রাপ্তি ও খুশির দিন। দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হলেও দিনের আনন্দ–উৎসবের অংশীদার জাতির সর্ব শ্রেণির মানুষ। এদিন শিশুরা আনন্দ-খুশির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেনে নেয়–এই মহান মানুষটির কারণেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আমাদের পরম প্রিয় মানুষ। তিনি এ অঞ্চলের সর্বহারা মানুষের বিশ্বাসকে ধারণ করেই সংগ্রাম-আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন বটে, নিয়ম ভেঙেছেন কিন্তু অনিয়ম করেননি। তাঁকে লড়তে হয়েছিল পাঞ্জাবি এবং দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে। আপোশহীন এবং অনঢ়-অটল ছিলেন তিনি জাতিগত প্রশ্নে। শুধু তাই নয়, অন্যকে

শিশুদের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান – ফাইল ছবি

প্রভাবিত করার জাদুকরী গুণ ছিল তাঁর কর্মকাণ্ডে। মানুষকে সহজেই বাণীধ্বনির মাধ্যমে জাগাতে পারতেন। এজন্য পৃথিবীর আর দু'দশজন বাগ্মী নেতার সারিতেও বঙ্গবন্ধু অমর নাম।

কৈশোর থেকেই তাঁর সংগ্রামী জীবন শুরু। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সাহচর্য ও সাক্ষাৎ এবং দর্শন তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং তা রুখে দেবার প্রত্যয়ে সংগঠিত হওয়ার স্পৃহা তাঁকে সাহস যুগিয়েছে। কোনো লোভ-লালসা তাঁকে পেছনে ফেরাতে পারেনি।

শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, ভাসানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা তাঁকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কোনো দূরের মানুষ নন, বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উঠে আসা একজন সচেতন মানুষ। তাঁর সংগ্রামী জীবন, জেল জীবন, ষড়যন্ত্র মামলা, গণ-অভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, পাকি কারাগারে ফাঁসির উদ্যোগ, স্বদেশে ফেরা, দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ এবং সর্বশেষ সপরিবার আত্মবিসর্জন আমাদের সামনেই ঘটেছে এবং আমরাই তাঁর সাক্ষী। তাঁর বিপ্লবী চেতনার উন্মেষকালে সমগ্র বাঙালি জাতি তাঁকে সাহস যুগিয়েছে। তা না হলে সেই অজপাড়া গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং 'সাব গোছের' একটি (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পৃষ্ঠা-৩) পরিবারের সন্তান কীভাবে একটি অবহেলিত জাতিকে উদ্বেলিত করে মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন। কৈশোরে গোপালগঞ্জে হাজতবাস, মাদারীপুরে সুভাস বোসের অনুসারীদের সঙ্গ লাভ, কলেজ জীবনে বেকার হোস্টেলে থাকা এবং হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে সক্রিয় থাকার প্রভাবে জীবন পালটে যায়। দেশ বিভক্তিতে আশা ভঙ্গ, মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অনিয়ম, নতুন পাকি স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হওয়ার বিষয়টি তাঁকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দেয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তিনি বুঝতে পারেন টু-নেশন মতবাদ ভুল। তাই অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভের সহজ উপায় ৬ দফা। এ পর্যায়েও তিনি নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন। কিন্তু পাকি শোষণ, নির্যাতন ও বাঙালি নিধন তাঁকে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। জনগণ জেলের তালা ভেঙে তাঁকে ছিনিয়ে আনে। আয়ুব বিদায় নেয় আরেক শয়তানরূপী জেনারেলকে রেখে। এই লোকটি বঙ্গবন্ধুকে জেলে পোরে, ফাঁসির নাটক সাজায়। ততক্ষণে সমগ্র বাঙালি জাতি ৭ মার্চের দিকনির্দেশনার আলোকে যুদ্ধে নেমেছে। নয় মাসেই অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার স্থপতি ও মহানায়ক বঙ্গবন্ধু। তাঁর আশপাশেও কাউকে আমরা দাঁড় করিয়ে দিতে পারি না। তবে পেছনে ছিল তাঁর সহচরবৃন্দ ও বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী, যাদের তিনি তিলে তিলে সেই ১৯৪৮ সাল থেকে বিপ্লবের মোহমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর এবং বাঙালির স্বপ্নসাধ পূর্ণ হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে। তিনি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এলেই বাঙালির হাজার বছরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়। তাঁর জন্মে সার্থকতা পায় বাংলাদেশ। তিনি আমাদের উপহার দেন নতুন দেশের সংবিধান। স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি, মিত্রবাহিনী ফিরিয়ে নেওয়া এবং '৭৩-এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর কারণেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় উন্নয়ন এবং নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠা, জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ ও বিশ্বের মানবতাবাদী রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুর জন্যই সম্পন্ন হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ ২০১৬ ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন –পিআইডি

এমন মহান মানুষটির জীবদ্দশায় কখনো জন্মদিন পালন করা হয়নি। তবে ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জন্মদিনের সকালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. নীলিমা ইব্রাহীম বঙ্গবন্ধুকে বাংলা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৭ মার্চ ২০১৬ বঙ্গবন্ধুর সমাধি কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিশুসমাবেশে শিশুদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

একাডেমি থেকে প্রকাশিত বই উপহার দেন। আর এর আগের বছর ১৯৭৩ সালের ১৭ মার্চ ড. মযহারুল ইসলাম, সচিব লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, তৎকালীন কর্মকর্তা সেলিনা হোসেন শিশুদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। পঁচাত্তরে গণভবনে বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিক জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায় কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর ও গার্লস গাইডের সদস্যরা। সেবারই আনুষ্ঠানিক প্রথম ও শেষ জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয় বঙ্গবন্ধুর। ঐদিন অবশ্য *বাংলার বাণী*'র শাপলা কুঁড়ির আসরের পক্ষ থেকে তাঁর বাসায় গিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুভেচ্ছা প্রতিনিধির পক্ষে আসরের ভাইবোনসহ পরিচালক বিমান ভট্টাচার্য, কথাশিল্পী ও বর্তমান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি অঘোষিত ছিল। ১৯৮১ সালের পূর্বে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠিত হলে জন্মদিন পালনের আনুষ্ঠানিকতা ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়। ১৯৮১ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা দেশে ফিরে এলে বিভিন্ন শিশু সংগঠন তাঁর জন্মদিনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা, বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা, কেন্দ্রীয় খেলাঘ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৯৩ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ড. নীলিমা ইব্রাহীম দিনটি জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। পরের বছর সারাদেশে সরকারি কর্মসূচি ছাড়া বিভিন্ন শিশু সংগঠন জাতীয়ভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। আর সরকারিভাবে উদ্‌যাপন শুরু হয় ১৯৯৭ সালের ১৭ মার্চ থেকে। মাঝে জামাত-বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ৫ বছর তা বন্ধ থাকে, তবে বেসরকারিভাবে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে জন্মদিনটি পালন করা হয়। এই হলো জাতির পিতার জন্মদিন পালনের ইতিবৃত্ত।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের ভীষণ ভালোবাসতেন। শিশুরা স্বাধীন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করবে–এমন স্বপ্ন দেখতেন সেই কৈশোর ও যুবা বয়সে। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর শিশুশিক্ষা জাতীয়করণ, সংবিধানে ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের বিষয় অন্তর্ভুক্তি এবং তাঁরই নির্দেশে শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন। প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণকালে বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা ছবি নিয়ে সেদেশের প্রেসিডেন্টকে উপহার হিসেবে হস্তান্তর শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার আর এক দৃষ্টান্ত। আমরা অনেকেই জানি না– কৈশোরে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই সম্পাদিত কচিকাঁচার আসরে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। ছোটোদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা। শত কাজের মাঝেও তিনি শিশুদের অনুষ্ঠানে যেতে ভুলতেন না। কচিকাঁচার আসর ও খেলাঘরের অনুষ্ঠানে নিয়মিত যেতেন।

শিশুপ্রিয় এই মানুষটির একটি ঘটনার কথা বলি। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ গঠন করা হলে দেখা যায় ঐ সর্বদলীয় প্লাটফর্মে কোনো শিশুদের শাখা রাখা হয়নি। বিষয়টি তাঁকে অবগত করা হলে তিনি সাথে সাথে ছাত্র শাখার প্রধান শেখ শহীদুল ইসলামকে এ বিষয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। আর তখনই শেখ শহীদুল ইসলাম, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ও ড. আবদুল্লাহ আল মতীকে নিয়ে শিশু সংগঠনের নীতিমালা ও শিশু উন্নয়নের প্রস্তাব তৈরি করান। '৭৫-এর সেই জঘন্য ঘটনার জন্য ঐ প্রস্তাব আলোর মুখ দেখেনি। শিশুদের প্রতি তাঁর এমন দরদের কথা আমাদের অনেকের কাছে অজ্ঞাত।

বঙ্গবন্ধুর কাছে শিশুরা ছিল বেহেশতের ফুলের মতো। শিশুদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। অনেক অনুষ্ঠান এবং বিদেশ ভ্রমণে দেখা গেছে তাঁর শিশুপুত্র রাসেলকে সঙ্গী হতে। ঈদের নামাজও আদায় করতেন রাসেলকে নিয়ে। আবার দলীয় সহচরদের বাড়িতে গেলে পরিবারের ছোটোদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যেতেন। শিশুদের প্রতি এমনই ছিল বঙ্গবন্ধুর দরদ।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির প্রিয় নাম, প্রিয় মানুষ। তাঁর জন্মদিনটি ছোটোদের কাছে অতীব খুশি ও আনন্দের। এদিন ছুটির কারণে শিশুরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। পাশাপাশি তারা খুশির মাঝে জেনে নেয়-এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম নিয়ে বাঙালির স্বপ্নসাধ পূরণ করেছিলেন।

লেখক : সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

ইসলামের ইতিহাসে ইনশাআল্লাহ এবং ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান

পবিত্র কোরআনের সূরা কাহফ-এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ইহুদিরা একবার মক্কার কাফেরদের শিখিয়ে দিল, তোমরা মুহাম্মদের কাছে যাও এবং তাঁকে প্রশ্ন কর, সে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে কিছু জানে কি-না। কাফেররা মুহাম্মদ সা.-এর কাছে এসে বলল, আপনি আমাদের আসহাবে কাহফ সম্পর্কে বলুন। মুহাম্মদ সা. তাদের বলে দিলেন, তোমরা আগামীকাল আস, আমি তোমাদের আসহাবে কাহফ সম্পর্কে বলব। পরদিন কাফেররা আসল, কিন্তু নবি সা. আসহাবে কাহফ সম্পর্কে কিছু বলতে পারলেন না। এ না বলতে পারা পনেরো দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ পনেরো দিন জিবরাইল আ. নবি সা.-এর কাছে অবতীর্ণ হননি, ফলে ওহি আসাও বন্ধ ছিল। পনেরো দিন পর জিবরাইল আ. অবতীর্ণ হলেন এবং আল্লাহর ওহি ব্যক্ত করলেন,

> 'ইনশাআল্লাহ' না বলে আপনি কখনো কোনো কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, 'আমি ওটা আগামীকাল করব'। যদি ভুলে যান, তবে আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করবেন...। [২৩ এবং ২৪ নম্বর আয়াত, সূরা কাহফ]।

পনেরো দিন পর এভাবে মুহাম্মদ সা.- এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সংযোগ ঘটল। নবি সা. খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সময়মতো উত্তর দিতে না পারায় কাফের এবং মুশরিকরা নবি সা.কে নিয়ে হাসিঠাট্টা ও বিদ্রুপ-উপহাস করা শুরু করে দিয়েছিল। পনেরো দিন পর প্রশ্নের উত্তরও আসে, পাশাপাশি নবি সা. এবং তাঁর উম্মতদের জন্য আল্লাহ তাআলার নসিহত জারি হয় যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মুফতি শাফী র. তাঁর তাফসিরে এ বিষয়ে বলেন,

> ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার : যদি আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ বাক্যের অর্থ তাই। [*পবিত্র কোরআনুল কারীম*, মুফতি শাফী র.-এর তাফসির, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হিজরি, পৃষ্ঠা-৮০৫]

মুফতি শাফী র. এ বিষয়ে আরো ফতোয়া দিয়েছেন যে, ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' মুস্তাহাব। ভুলক্রমে যদি বাক্যটি বলা না হয়ে থাকে, তবে যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা পড়ে নিতে হবে। [মুফতি শাফী র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৮০৫-৮০৬]।

নবি সা.-এর জমানার কোরআন তাফসিরকার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর তাফসিরে জানান,

> মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় নবি সা.- এর কাছে রুহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন যে, আগামীকাল তোমাদের উত্তর প্রদান করব, কিন্তু 'ইনশাআল্লাহ' বলেছিলেন না। [*তাফসীরে ইবন আব্বাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১]।

৭ মার্চ ১৯৭১ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৭ মার্চ ১৯৭১ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে সমবেত জনতার মাঝে অসংখ্য নারী

তবে অধিকাংশ তাফসিরকার বলেছেন, প্রশ্নটি আসহাবে কাহফ-এর কাহিনি সম্পর্কেই ছিল। প্রশ্ন যে বিষয়েই হোক, এখানে মূল বিষয় কোনো কাজ বা কথার প্রতিশ্রুতিতে 'ইনশাআল্লাহ' বলা জরুরি। মুফতি শাফী র. বলেছেন, 'ইনশাআল্লাহ' বলার মাধ্যমে বান্দা বরকত লাভ করে এবং আল্লাহর কাছে বান্দার দাসত্বের স্বীকারোক্তিও ঘটে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। পাকিস্তানিরা যখন বাঙালিদের উপর এক অন্যায় সমর চাপিয়ে দিল তখন যুদ্ধ ছাড়া এদেশের মানুষের কাছে বিকল্প আর কিছু ছিল না। সেদিনের সমরনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ, ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণে সে বিকল্পের সমাধান ঘটে। বঙ্গবন্ধু সেদিন তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তাঁর জনগণের উদ্দেশে বলেন,

মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। [ভাষণের টেকস্ট, *শ্রেষ্ঠ বাঙালি*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা ২০১২, পৃষ্ঠা-২৫৫]।

যাঁরা ধর্মনিষ্ঠ, তাঁরা মনে করেন, ভাষণের ঐ একটি শব্দ 'ইনশাআল্লাহ' সমগ্র দৃশ্যপটকে পরিবর্তন করে দেয়। কারণ পাকিস্তানিরা ১৯৪৭–১৯৭১ পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল শুধু ইসলামের নামে। তাদের বিরোধিতাকে তারা ইসলামের বিরোধিতা বলে প্রচার করত। তাদের প্রপাগান্ডা এতটা শক্তিশালী ছিল যে, পাকিস্তান, পাকিস্তানের শাসক মিলিটারি জান্তা এবং ইসলাম এক হয়ে গিয়েছিল। ধর্মপ্রাণ মানুষ মনে করত, যা-ই হোক, ইসলামের জন্য পাকিস্তান টিকে থাকা দরকার। পাকিস্তানি পাঞ্জাবি শাসকবর্গ যে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য 'ইসলাম'- এর ধুঁয়া তুলছে, তা তলিয়ে দেখতে সাধারণ মানুষ পারেনি। পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসে একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান আসেনি, যার লেবাস ইসলামি অথবা মুখমণ্ডলে ইসলামি শরিয়াহর চিহ্ন ছিল, এখনো নেই। একটা ইসলামি প্রজাতন্ত্র, অথচ তার শাসক নেতারা পাশ্চাত্য খ্রিষ্টীয় রীতিনীতি, মদ-জুয়া-নারীতে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের টিকে থাকা সম্ভব ছিল না, ভাঙন ছিল অনিবার্য। আল্লাহ সোবহানু তাআলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে সে কাজটি করে দিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন ৭ মার্চ 'ইনশাআল্লাহ' বলে ফেললেন তখন সকল সংশয় দূর হয়ে গেল।

একজন আলেম এ লেখককে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তারা যখন মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন, তখন তাদের ওস্তাদদের ১৯৭১-এর এ ঘটনাময় দিনগুলোতে খুবই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখতেন। ইসলামের সুরক্ষার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানিদের জুলুম, নির্যাতন ও গোয়ার্তুমির জন্য সে পাকিস্তান ভাঙতে বসেছে। এমন অবস্থায় যখন ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ'–তখন সকল সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু এ কঠিন সমরে আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছেন। তাই বাঙালিদের জন্য পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ সহজ হয়ে গিয়েছিল। [সাক্ষাৎকার: মাওলানা সোলায়মান, ইমাম, শাহবাগ চাঁদ মসজিদ, ঢাকা]।

ইসলামের ইতিহাসে ইনশাআল্লাহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সকল উম্মতের জন্য তা জরুরি। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু সে জরুরি কাজটি করেছিলেন, ফলে বাঙালিদের শুধু বিজয় ঘটেনি, বিজয়টি এত দ্রুত ঘটেছিল যে, বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ছিল এটি একটি বিরল ঘটনা, মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়, বঙ্গবন্ধুর ভাষণে 'ইনশাআল্লাহ'র ফজিলত এতটাই বরকতময় হয়ে উঠেছিল।

লেখক : লেখক ও গবেষক

নিবন্ধ

স্বাধীনতার ৪৬তম বার্ষিকীতে বাংলাদেশের অগ্রগতি

ড. আতিউর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ শেষে বিজয় অর্জিত হয়, পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু একটি শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এরপর পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ প্রায় ৪৬ বছর । তাই বিশ্লেষণ করতে চাই, তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশ কতদূর এগিয়েছে।

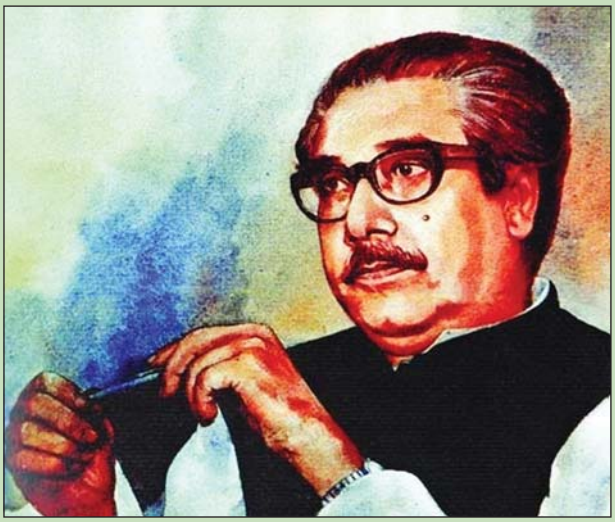

বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীনতার বিকল্প কোনো শব্দ নেই। বাঙালি জাতির ভাগ্যে সেই চিরন্তন শব্দটির রূপদান করেছেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিংবদন্তি এ নেতা বাঙালি জাতির মুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। নিজের জীবনের সুখ-স্বস্তি, আরাম-আয়েশ, মোহ, ধনদৌলত–সবকিছু ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এদেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামেই ছিল তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একথাই যেন ব্যক্ত হয়েছে অন্নদাশংকর রায়ের লেখায়, 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত জাতি গঠন, বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ও সোনার বাংলা গড়াই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র ব্রত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য– এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে এদেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, বেকারত্ব দূর হবে– সেই ভাবনাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে।

বঙ্গবন্ধু সর্বদাই বাঙালি জাতি এবং বিশ্বের নির্যাতিত-শোষিত-মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন, যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায়। ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেন, 'বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত– শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' নানা বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা, মানমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মৌল আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কথা বার বার বলেছেন।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক আদর্শ ও কৌশল ছিল– নিজস্ব সম্পদের ওপর দেশকে দাঁড় করানো। সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালনা করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, স্বাধীনতা লাভের পর পরই সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত হন। তখন ছিল না অর্থ, অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি, শিল্প কারখানা, রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স ও বিদেশি মুদ্রার মজুত। বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ ও বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অভাব-অনটনের দেশ হিসেবে। তখন পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের পরীক্ষার মুখে পড়া এক অসহায় দেশ হিসেবে দেখেছেন। দেশের অর্থনীতিকে সচল করতে যেসব সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা শেষ করার মতো যথেষ্ট সময় বঙ্গবন্ধু পাননি। তবে ঐ উদ্যোগগুলো তিনি নিয়েছিলেন বলেই এতদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মজবুত পাটাতন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কৃষকের পক্ষে ষাটের দশকে ছয় দফা আন্দোলনে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলেছেন। সত্তরের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দলীয় সদস্যগণের শপথ বাক্য পাঠ উপলক্ষে এক বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।' (*শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম*, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)

তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, কৃষিই এদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। কৃষকেরাই এদেশের প্রাণ। সোনার বাংলা গড়ার কারিগর। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বঙ্গবন্ধু কৃষকদের কথা বলেন এভাবে, 'আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।' (*শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম*, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)

কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা, কৃষকের মাঝে খাসজমি

বিতরণ, কৃষির উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ভরতুকি মূল্যে কৃষকদের সার ও কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেওয়া, পচনশীল ফসল সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান–এসব কিছুরই সূচনা করে গেছেন। সদ্য স্বাধীন দেশের ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণে তাৎক্ষণিক আমদানি এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি শাসনকালের দশলাখসার্টিফিকেটমামলাথেকে কৃষকদের মুক্তি ও তাদের সকল ঋণ সুদসহ মাফ করে দেন। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য রহিত করেন। পরিবার পিছু জমির সিলিং একশ বিঘায় নির্ধারণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ জানুয়ারি ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০ প্রদান করেন –পিআইডি

বঙ্গবন্ধুর সচেতন ও কৃষক দরদি নীতির ফলে কৃষিতে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষি খাত শক্তিশালী হয়েছে। কম দামে সার, বীজ, সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং কৃষি গবেষণা, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের ভূমির অধিকার, ঋণপ্রাপ্তির অধিকার, উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পাবার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের শিক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এসব নীতি-কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রকৃত কৃষক, বর্গাচাষি ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সেবাসহ আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কৃষকের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রণয়ন করা হচ্ছে যুগোপযোগী কৃষিঋণ নীতিমালা। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বিপ্লব ঘটে গেছে। ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষির ওপর। বর্তমানে ৪ কোটি টন খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে। পাঁচ-ছয় বছর আগেও বাংলাদেশ চাল আমদানিতে প্রতিবছর এক বিলিয়ন ডলার খরচ করত। এখন চাল আমদানি করতে হয় না বললেই চলে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এখন পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত করছে বাংলাদেশ। কৃষকের ছেলেমেয়েরা এখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করতে পারছে। কৃষকরা আজ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য মূল্য সঠিকভাবে যাচাই করতে পারছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করছে নতুন মাত্রায় দেশের উন্নয়নে অপরিহার্য খাতগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দিতে। বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র, মাঝারি, নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এমনকি বর্গাচাষিদের জন্যও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ধারা অক্ষুণ্ন রেখে ব্যাংকিং খাতকে কাজে লাগিয়ে দেশের গরিব, অসহায়, বঞ্চিতদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি।

নিম্ন আয়ের কৃষক, অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্ট শ্রমিক, সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মী, কর্মজীবী পথশিশুসহ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল ভোগকারী মানুষদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আজ তাদের দশ টাকার ব্যাংক হিসাব সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে গেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ব্যাংক হিসাব খুলে সঞ্চয় করতে পারছে। কম খরচে ও দ্রুত টাকা পাঠানোর জন্য চালু করা হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা। দেশব্যাপী এ নতুন সেবার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। প্রায় ৩ কোটি মানুষ হিসাব খুলে এ সেবা নিচ্ছে। জনস্বার্থে গ্রিন ব্যাংকিং, সিএসআর, এজেন্ট ব্যাংকিং, আর্থিক শিক্ষার মতো সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গরিব-দুঃখী মানুষের উন্নয়নে সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলো এখন পাঁচশ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকেও একটি সিএসআর তহবিল গঠন করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, দরিদ্রের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এই নতুন ধারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি মানবিক ও উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। খুবই আনন্দের বিষয়, পুরো ব্যাংকিং খাতও এখন অনেকটাই মানবিক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে দেশে আর্থিক খাতের সুস্থিতি ও রেজিলিয়ানস অনেকটাই বেড়েছে। অর্থনৈতিক খাতের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের হার, গড় আয়ুসহ অনেক সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তন এখন লক্ষণীয়। দারিদ্র্য প্রায় ২২.৪ ভাগে নেমে এসেছে। এই হার আগামী দিনে আরো দ্রুত কমবে বলে আশা করা যায়। অর্থনীতির সব সূচকই এখন ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। টাকার মূল্যমান

স্থিতিশীল ও জোরালো অবস্থায় রয়েছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বৈদেশিক অর্থনৈতিক খাতের শক্তির জোরেই আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছি। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার পরিবেশেও গত এক দশক ধরে গড়ে ৬.২ শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৬৬ ডলার। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের পরিচয় পেয়ে গেছে। দ্রুতই পুরোপুরি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও গর্বের প্রতীক। উজ্জীবিত বক্তা, স্বপ্নদ্রষ্টা ও এমন এক প্রাণের নেতা যাঁর ছিল অনন্য ক্যারিশমা। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পর বাংলাদেশ আজ অদম্য। তাঁর স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে বাংলাদেশে। এই দেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্বকেই চমকে দিয়েছে। আর্থসামাজিক সূচকগুলোই প্রমাণ দেয় বাংলাদেশ আজ এই উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাখো শহিদের স্বপ্নের প্রতিও দেশ আজ সুবিচার করে চলেছে। একসময় যারা হতাশ হয়ে দেশটির স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্র হওয়াকে হঠকারী সিদ্ধান্ত মনে করেছেন, যারা আশঙ্কা করেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া অকার্যকর রাষ্ট্রের তালিকায় শামিল হবে– সেইসব নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশ এ সমস্ত মিথ ও ভ্রান্ত পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে অভাবনীয়ভাবে ধ্বংসাবশেষ থেকে ফিনিকস পাখির মতো উঠে এসেছে। যারা সে সময়ে হতাশা ছড়িয়েছিলেন তারাই এখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নমুখী নীতিকে এখন দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বের নানা কোণ থেকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশও পুরস্কৃত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির ও একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে আমরা আমাদের ধ্যানে, ত্যাগে, শ্রমের মাধ্যমে রূপায়ণ করব– এটাই হোক আমাদের আজকের শপথ। তাঁর গরিব হিতৈষী উন্নয়ন কৌশলকে বাস্তবে রূপায়ণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাত কৃষক, খুদে উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তাসহ সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের মাধ্যমেই আমরা বঙ্গবন্ধুকে এদেশের মানুষের মণিকোঠায় পৌঁছে দিতে চাই। আমরা এরই মধ্যে প্রতিটি নোট ও মুদ্রায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি যুক্ত করেছি। আসুন, সবাই মিলে অঙ্গীকার করি–তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলবোই। এই অঙ্গীকারই হবে আজকের দিনের সবচেয়ে বড়ো শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

নিবন্ধ

মহান মুক্তিযুদ্ধে নৃশংস গণহত্যা

নাজনীন সুলতানা নীতি

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এক অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের পরিণতিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল নিয়ে জন্ম নেয় পাকিস্তান নামে একটি দেশ এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ভারত। এই বিভাজনের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্ভুত এক দেশের জন্ম হলো, যে দেশের দুটি অংশ দুই পৃথক স্থানে অবস্থিত। মাঝখানে দুই হাজার কিলোমিটার ব্যবধান রেখে পাকিস্তানের দুটি অংশ পরিচিত হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে।

দুটি অংশের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যই ছিল না। ভূখণ্ডগত ব্যবধানসহ আচার, আচরণ, ঐতিহ্য, পোশাক, সংস্কৃতি সবকিছুই ছিল ভিন্ন। তারপরও ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে অনগ্রসর পূর্ব পাকিস্তান আশা করেছিল পাকিস্তানের দুটি অংশেই সমতাভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। দুটি অংশই সমানভাবে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে, সমৃদ্ধ হবে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন দেশ ভাগের পূর্বে এই অঞ্চলটি ব্রিটিশ প্রশাসনের অবহেলার দরুন যেসব বাধা-বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিল, দেশভাগের মধ্যদিয়ে সে দুর্ভোগের অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবতার রূঢ়তা ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকল পরবর্তী চব্বিশ বছরের বিভেদ, বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা আর ষড়যন্ত্রের এক অনবদ্য ইতিহাসের মধ্যদিয়ে। এই সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু অবহেলাই করেনি, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, সামরিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রতি তারা নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে। পূর্ব পাকিস্তান শাসনের নামে এখানে তারা অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ তথা আন্তঃরাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেছিল। কিন্তু ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়, ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা, ৬ দফা পরবর্তী ছাত্রদের ১১ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয়– এই প্রত্যেকটি স্বতস্ফূর্ত ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে বাঙালি জনগণ প্রমাণ করেছিলেন তারা কারো ইচ্ছের দাসত্ব করবে না।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের অনুপ্রেরণায় একদিকে পূর্ব বাংলার মানুষ যেমন স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুত হতে থাকে অন্যদিকে এসময় থেকেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে। তার আদেশে বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হয়। ইয়াহিয়া খান ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলার মানুষকে তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে না দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিস্থিতি উন্নয়নের আশ্বাস দিয়ে সাজানো বৈঠকের আয়োজন করতে থাকে। অন্যদিকে দেশের নৌ ও আকাশপথে প্রচুর অস্ত্র গোপনে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়।

এমনি উত্তেজনাপূর্ণ থমথমে পরিস্থিতির ভেতর ২৫ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তান সামরিকবাহিনী শুরু করে অপারেশন সার্চ লাইট নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। সেদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত প্রদান করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে রওয়ানা হয়ে যায়। যাবার পূর্বে *এশিয়ান টাইমস*'র ভাষ্য অনুযায়ী, সামরিকবাহিনীর বড়ো বড়ো অফিসারদের নিয়ে একটি বৈঠকে ইয়াহিয়া নির্দেশ করেছিল, 'ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে'। সেভাবেই ২৫ মার্চ রাতে শুরু হয় গণহত্যা– যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের সকল প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়া। সেই রাতে এগারোটা বাজতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাসদস্যদের ওপর হামলা চালায়। তারা পিলখানাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক, খিলগাঁওয়ের আনসার সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন ও ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতে হামলা চালায়। এতে শত শত অফিসার, জওয়ান, শিক্ষক ও ছাত্র নির্মমভাবে নিহত হন। অনেক ঘরবাড়ি ও পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। মর্টার হামলা চালানো হয়। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলো পুরোপুরি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন একরাতেই সেনাবাহিনী প্রায় সাত হাজার নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। ধ্বংসযজ্ঞ সেদিন সবে শুরু হয়েছিল। পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার অর্ধেক মানুষ পালিয়ে যায় এবং ত্রিশ হাজার মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ১৯৭১-এর এপ্রিল এবং মে মাসে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়। চট্টগ্রামেও শুরু হয় গণহত্যা। এসময় হানাদারবাহিনীর করালগ্রাস থেকে বাঁচতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দিকভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। প্রায় এক কোটি মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ঢাকাসহ বড় বড় শহর থেকে দশ কোটি মানুষ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানেও রেহাই মেলেনি। পাকিস্তানিরা ঢাকা, চট্টগ্রামের পর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসলীলা অব্যাহত রেখেছিল।

এতকিছুর পরও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিগণ ভেঙে পড়েনি। বরং বিপরীতই হয়েছিল। পঁচিশ মার্চ রাতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে যখন ঢাকা পুড়েছিল, সে আগুনে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান গঠনের বিভ্রান্তিটুকুও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েছিল। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার পর দেশব্যাপী সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধারা দখলদারবাহিনীর ওপর পালটা হামলা শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরসমূহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আকাশপথে বিমান, নৌপথে গ্রামের পর গ্রাম ও শহরে হামলা চালিয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করে অসহায় সাধারণ গ্রামবাসীকে। নবজাতক শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি তাদের বন্দুক ও বেয়নেটের খোঁচা থেকে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন। লুণ্ঠিত হয় বহু মূল্যবান সম্পদ। পাকিস্তানিরা বাংলার মাটিতে পোড়ামাটি নীতি সফল বাস্তবায়ন করেছিল। তারা কতটা নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল সেটি একজন পাকিস্তানি সৈন্যের স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়, 'আমাদের হিন্দু ও কাফির (ঈশ্বরে অবিশ্বাসী)দের হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। জুন মাসের একদিন আমরা একটি গ্রামে অভিযানে যাই এবং সেখানে আমাদের কাফিরদের হত্যা করতে বলা হয়। গ্রামের সব নারীরা তখন পবিত্র কুরআন পাঠ করছিল। কিন্তু তাদের ভাগ্য ভাল ছিল না। কমান্ডিং অফিসার আমাদের সময় নষ্ট না করার আদেশ দিয়েছিলেন' (বাংলাদেশ জেনোসাইড আর্কাইভ)। বোঝা যায়, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বিধর্মীদের হত্যার অজুহাতে যে গণহত্যা চালিয়েছিল সেখানে ধর্ম কোনোভাবেই মুখ্য বিষয় ছিল না, মুখ্য ছিল রাজনৈতিক কুচক্র।

১৯৭১ সালের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি বিজড়িত রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ –ফাইল ছবি

১৯৭১ সালে সবচেয়ে বেশি গণহত্যার শিকার হন এদেশের কিশোর, তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গ। বীভৎস এই গণহত্যার খবর যেন কোনোভাবে বাইরের বিশ্ব না জানতে পারে সেজন্য প্রেস সেন্সর করা হয়। সংবাদ পাঠানোর সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো পৃথিবীকে জানান দিয়ে যাচ্ছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উভয় অংশের অখণ্ডতা রক্ষা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের মূল শর্ত। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী লোক এই ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব-বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান তার স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে সব ধরনের বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর'। বহির্বিশ্ব ভুট্টোর এসব বানোয়াট তথ্য বিশ্বাস করেছিল এমনকি তাকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও প্রত্যক্ষ সবধরনের সহযোগিতাও প্রদান করেছিল। '৭১-এর জুলাই মাসে বাইরের সংবাদপত্রে ছবিসহ প্রথম বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। খ্যাতনামা সাংবাদিক সাইমন ড্রিং সব ধরনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে *ওয়াশিংটন পোস্টের* মাধ্যমে গণহত্যার খবর সারা পৃথিবীতে জানিয়েছিলেন। পাকিস্তানের *মর্নিং নিউজের* স্বনামধন্য সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসক্যারেনহাস জুন মাসে *সানডে টাইমসে* একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন যা পুরো বিশ্বের সামনে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার বীভৎসতাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। অ্যান্থনি ম্যাসক্যারেনহাস এই প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য নিজের চাকরি, নিজের নিরাপত্তা কোনোকিছু বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এভাবেই বেশ কিছু বিবেকবোধসম্পন্ন উদ্যোগ পাকিস্তানের অক্ষুণ্নতা প্রসঙ্গে বহির্বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিতে সক্ষম হয়। তবু প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশ এগিয়ে আসেনি আবার স্বাধীন হওয়ার পরও অনেক দেশ থেকে স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বাইরের প্রভাবশালী পত্রপত্রিকায় গণহত্যার খবর প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় ভুট্টোর সরকার বুঝতে পারছিল আন্তর্জাতিক মহলকে আর ধোঁকায় রাখা সম্ভব নয় আবার পূর্ব পাকিস্তানকেও অধীন করে রাখা যাবে না। এবার পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য এক জঘন্য পরিকল্পনা করল। তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অনুগতদের সমন্বয়ে রাজাকার, আল বদর, আল শামসবাহিনী গড়ে তোলে। পাকিস্তানের অনুগত এই দোসরেরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে এ অঞ্চলের তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করত। দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে তারা পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে বন্দি করত। সেখানে হাত, পা, চোখ বেঁধে তাদের অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হতো। তারপর সেভাবেই হানাদারবাহিনীর নির্দিষ্ট কিছু ইটভাটায় নিয়ে হত্যা করে ফেলে রাখা হতো, যেগুলো এখন বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১২৯টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও হত্যার পর গণকবর দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির (WCCFC) গবেষণায় জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন ৯০ ভাগ অবাঙালি পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এবং তারা গণহত্যাযজ্ঞে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সরাসরি সহযোগিতা করেছিল। সারাদেশে গণহত্যার সাক্ষী হিসেবে প্রায় পাঁচ হাজার গণকবর আছে বলে মনে করা হয়। তবে WCCFC এ যাবৎ ৯৪০টি গণকবর চিহ্নিত করেছে। ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি ৭৪টি গণকবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ২৩টিই মিরপুরে অবস্থিত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গণকবর পাওয়া গিয়েছে ময়মনসিংহ জেলায় (৫২টি)।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরো পূর্ব বাংলা বিধ্বস্ত এক মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব বাংলার মুক্তিবাহিনী অপর্যাপ্ত অর্থ ও অস্ত্রের যোগান ও সংগঠনহীনতার দরুন সর্বশক্তি দিয়েও পাকিস্তানকে ঠেকাতে পারছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সুসংগঠিত এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ছিল। তাদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল আমেরিকা। তবে ৩ ডিসেম্বর থেকে যখন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল– বাংলার আকাশে তখন থেকে স্বাধীনতার সূর্য উঁকি দিতে শুরু করেছিল। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলার মুক্তিবাহিনী মাত্র বারো দিনের মাথায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে শোচনীয় পরাজয় বরণে বাধ্য করে। ১৬ ডিসেম্বর এল সেই আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির দিনক্ষণ। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম নৃশংস গণহত্যার পাথর বুকে করে লক্ষ লক্ষ অমূল্য জীবনের মূল্য দিয়ে প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে শোষণ-বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে জন্ম নিল এক নতুন ভূখণ্ড, বাংলাদেশ।

লেখক : মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধ

ঢাকা মহানগরীর পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

আবু নাছের টিপু

ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, মহানগরীতে প্রবেশ ও নির্গমন পয়েন্টগুলোতে যানজট নিরসন এবং ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে হালনাগাদ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা বা এসটিপি। ইতোপূর্বে ২০০৫–২০২৪ মেয়াদে ২০ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা বা স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান এসটিপি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু অনুমোদনের পর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কোনো বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর পর এসটিপিতে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে। এরই মধ্যে বেশকিছু প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, কিছু রয়েছে বাস্তবায়নাধীন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বিগত আট বছরে বিভিন্ন খাতে দেশে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ জুন ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে দেশের প্রথম মেট্রোরেল (এমআরটি-৬) প্রকল্প ও গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বিআরটি-এর জন্য নির্মিতব্য গাজীপুর বাস ডিপোর উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসংখ্যা ও আয়তন বেড়েছে। গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর ও দক্ষিণ– দুভাগে ভাগ করার পাশাপাশি কর্পোরেশন দুটির পরিধিও বাড়ানো হয়েছে। ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ঢাকার চারদিকে গড়ে উঠছে নতুন উপশহর, আবাসিক ও শিল্প এলাকা। এর ফলে পরিবহণের চাহিদা যেমন বাড়ছে তেমনি পরিবহণ ব্যবস্থাপনা ও সেবা যুগোপযোগীকরণের চাপও সরকারের ওপর বাড়ছে।

সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে সাম্প্রতিককালে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ায় বেড়েছে অর্থনীতির গতিশীলতা। এর পাশাপাশি ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহকে অভিন্ন পরিকল্পনার আওতায় আনতে গৃহীত এসটিপি সংশোধন ও হালনাগাদকরণের উদ্যোগ নেয় সরকার। এ প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধিষ্ণু এ মেগাসিটির পরিবহণ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়নে এসটিপি সংশোধন ও হালনাগাদকরণের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়। এসটিপি সংশোধনে সরকারের অনুরোধে সাড়া দেয় জাপান সরকার। এ ধারাবাহিকতায় জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা'র সহায়তায় ২০১৪ সালে এসটিপি হালনাগাদকরণের কাজ শুরু হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সাথে নিবিড় আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০১৫–২০৩৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা বা আরএসটিপি চূড়ান্ত করা হয়। সংশোধিত এসটিপি গত ২৯ আগস্ট মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

যানজট তথা পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় একান্ত জরুরি। এ মেগাসিটিতে নানান সংস্থা উন্নয়ন কাজ করছে। এ সকল দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক। এ বাস্তবতায় আরএসটিপি প্রণয়নকালে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের আগামী ২০ বছরের (২০১৫–২০৩৫) পরিকল্পনাসমূহ সংশোধিত এসটিপিতে অন্তর্ভুক্ত ও সমন্বয় করা হয়েছে। সংস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ– এলজিইডি
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর– সওজ
- বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি– বিআরটিএ
- বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটারট্রান্সপোর্ট অথরিটি– বিআইডব্লিউটিএ
- বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন– বিআইডব্লিউটিসি
- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ– বিবিএ
- বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন– বিআরটিসি
- বাংলাদেশ রেলওয়ে
- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ– ডিএমপি
- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অধিদপ্তর।

একজন যাত্রী একটি পরিবহণে উঠে নির্দিষ্ট গন্তব্যে গিয়ে নামা পর্যন্ত এক ট্রিপ ধরা হয়। এ হিসেবে ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক, ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ ও নির্গমন মুখ এবং ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিলিয়ন ট্রিপ তৈরি হয়। সংশোধিত এসটিপি অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ৪২ মিলিয়ন ট্রিপ এবং ২০৩৫ সালে ৫২ মিলিয়ন ট্রিপ তৈরি হবে। এই বিশাল পরিবহণ চাহিদা মেটানোর জন্য সংশোধিত এসটিপিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

আরএসটিপিতে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার গণপরিবহণ ও সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনায় যে সকল সুপারিশ এসেছে তন্মধ্যে রয়েছে :

- পাঁচটি ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা মেট্রোরেল রুট
- দুটি বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি সড়ক
- ইনার, মিডল এবং আউটার নামে তিনটি রিং রোড এবং
- ইনার ও আউটার রিং রোডকে সংযোগকারী আটটি রেডিয়াল সড়ক নির্মাণ।

প্রস্তাবিত আটটি রেডিয়াল সড়কের অ্যালাইনমেন্টও নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়কগুলো হচ্ছে :

- ঢাকা–জয়দেবপুর
- ঢাকা–টঙ্গী–ঘোড়াশাল

নির্মাণাধীন বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি রুট

প্রস্তাবিত ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা এমআরটি (মেট্রোরেল) রুট-১

- ঢাকা–পূর্বাচল–ভুলতা
- ঢাকা–কাঁচপুর–মেঘনা সেতু
- ঢাকা–সাইনবোর্ড–নারায়ণগঞ্জ
- ঢাকা–ঝিলমিল–ইকুরিয়া
- ঢাকা–আমিনবাজার–সাভার এবং
- ঢাকা–আশুলিয়া–ডিইপিজেড

এছাড়া ছয়টি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্সপ্রেসওয়েগুলো হচ্ছে :

- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
- ঢাকা–আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
- ঢাকা–চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে
- ঢাকা–সিলেট এক্সপ্রেসওয়ে
- ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে এবং
- ঢাকা–ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসওয়ে।

এর মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি ২১টি ট্রান্সপোর্টেশন হাব বা টার্মিনাল নির্মাণ এবং স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে আরএসটিপিতে। সুপারিশ অনুযায়ী প্রধান ট্রান্সপোর্টেশন হাব হবে :

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন
- মহাখালী বাস টার্মিনাল
- যাত্রাবাড়ী বাস টার্মিনাল
- গাবতলী বাস টার্মিনাল
- গাবতলী সার্কুলার ওয়াটারওয়ে স্টেশন এবং
- সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল

সংশোধিত এসটিপিতে ঢাকার চারপাশের বৃত্তাকার জলপথ উন্নয়ন, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাসরুট সমন্বয়করণ, বাস কোম্পানি গঠন, বাস টার্মিনালগুলোর স্থানান্তরসহ বাস পরিবহণ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

এছাড়া পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার পূর্বেই মুন্সিগঞ্জ জেলার বাউরভিটা থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার কাইকারটেক পর্যন্ত এবং মেট্রোরেল রুট ১-এর নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে বালু নদীর পূর্ব পাড় থেকে ঢাকা বাইপাসের পশ্চিম পাড়ের মধ্যবর্তী অংশের মধ্যে সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে এ সকল সুপারিশমালার মধ্যে কোনো কোনোটি বাস্তবায়িত হয়েছে আবার কোনোটি বাস্তবায়নাধীন। ইতোপূর্বে গৃহীত এসটিপির আওতায় ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন এবং পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় যে সকল প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

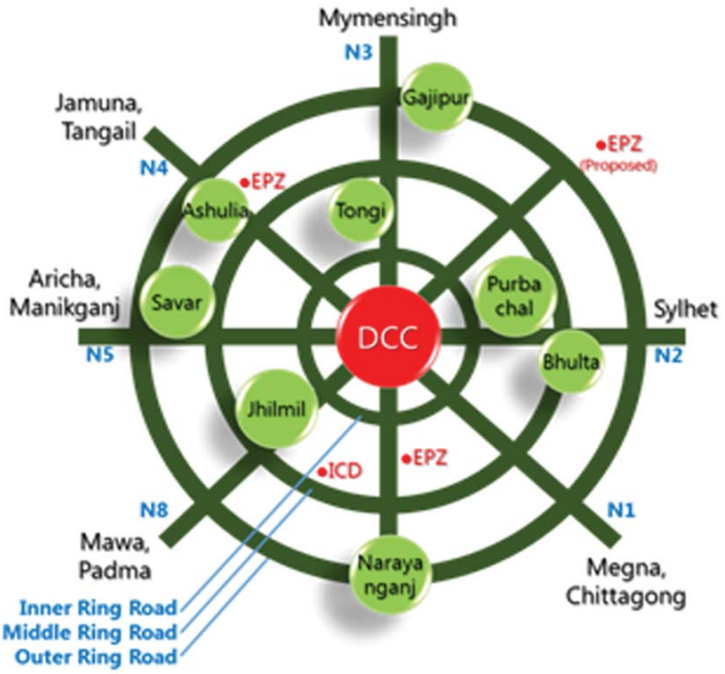

রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত আটটি রেডিয়াল সড়ক

- মিরপুর–এয়ারপোর্ট সড়কে জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার
- বেগুনবাড়ি–হাতিরঝিল এলাকার উন্নয়ন
- পিপিপিভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার
- টঙ্গীতে আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ
- আগারগাঁও–মিরপুর গ্রামীণ ব্যাংক সড়ক উন্নয়ন
- বিজয় সরণি– তেজগাঁও লিংক রোড নির্মাণ
- মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন
- যাত্রাবাড়ী থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত সড়ক আট লেনে উন্নীতকরণ
- বিরুলিয়া–আশুলিয়া সড়ক উন্নয়ন এবং বিরুলিয়া সেতু নির্মাণ
- বুড়িগঙ্গা নদীর উপর বসিলায় শহিদ বুদ্ধিজীবী সেতু নির্মাণ
- ঢাকা–মুন্সিগঞ্জ সড়কে মোক্তারপুর সেতু নির্মাণ
- শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সুলতানা কামাল সেতু নির্মাণ
- মিরপুর শিরনিরটেক–গাবতলী সড়ক নির্মাণ
- হাতিরঝিল–ডেমরা সড়ক নির্মাণ
- গাবতলীতে এবং কাঁচপুরে ইউ-লুপ সড়ক নির্মাণ

আবার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। তন্মধ্যে:

- গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত দেশের প্রথম বিআরটি নির্মাণের কাজ চলমান
- উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত দেশের প্রথম মেট্রোরেল রুট ৬-এর কাজ শুরু হয়েছে
- মগবাজার–মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ শেষ প্রান্তে। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে

নির্মাণাধীন ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা এমআরটি (মেট্রোরেল) রুট-৬

- শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে
- পিপিপিভিত্তিক ঢাকা বাইপাস মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে
- জাইকার অর্থায়নে মেট্রোরেল রুট ১ ও রুট ৫-এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এয়ারপোর্ট থেকে ঝিলমিল পর্যন্ত বিআরটি রুটের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে; তেরোমুখ–বিরুলিয়া–গাবতলী–সদরঘাট–চাষাঢ়া–শিমরাইল–ডেমরা পর্যন্ত ঢাকা সার্কুলার রুটের দ্বিতীয় অংশ ও ডেমরা–তেরোমুখ ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- বাস সেক্টর পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

লেখক: সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন

জেআর লিপি

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবসে সারাবিশ্বে উচ্চারিত হয় নারীদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের বাণী। আলোচনা হয় নারী-পুরুষ সমতা ও নারী মুক্তি প্রসঙ্গ। ১৮৫৭ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সুচ কারখানার হাজার হাজার নারী শ্রমিক শ্রমঘণ্টা ও মজুরি বৈষম্য হ্রাসের দাবিতে বিক্ষোভ করে। সেদিন অসংখ্য নারী পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। পরে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রচেষ্টায় এই দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি পায় নারীদের অধিকার আদায়ের প্রতীকী দিন হিসেবে। বিশ্বজুড়ে নারীরাই যে শুধু দিবসটি পালন করছেন তা নয়, বরং অনেক সচেতন পুরুষ দিবসটি পালনে এগিয়ে এসেছেন সর্বাত্মকভাবে। নারী দিবস পালনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা অনেকটাই সাফল্যের মুখ দেখেছে। বাংলাদেশের মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছে, নারী-পুরুষের বৈষম্য কমেছে, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন।

বাংলাদেশকে বলা হয় এক অনন্ত সম্ভাবনার দেশ। এ দেশের রয়েছে গর্ব করার মতো বেশ কিছু অর্জন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম আর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন। নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার কারণে এসব ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আর এ কারণে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ দুই ধাপ অগ্রগতিও অর্জন করেছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। আদিকালে কৃষি সভ্যতার সূচনা যেমন হয়েছে নারীর হাত ধরে তেমনি আধুনিক সমাজ বিনির্মাণেও রয়েছে নারীর অসামান্য অবদান।

নারী আজ সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে, পারিবারিক বিধিনিষেধ ও পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজাল ভেদ করে অধিকার আদায়ে অনেক বেশি সোচ্চার, অনেক বেশি সংগ্রামী। ঘর-গৃহস্থালি থেকে শুরু করে চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশল, আইন, নার্সিং, শিক্ষকতা, খেলাধুলা, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ পেশাদারীর সকল স্তর এখন নারীর পদচারণায় মুখরিত। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর সমান অংশগ্রহণ ও মৌলিক মানবাধিকার ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করে বাংলাদেশের সংবিধান। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন' সনদে (সিডও) স্বাক্ষর করে। তাই বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র তৈরিতে নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ মার্চ ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

নেতৃত্বে নারী : নারী নেতৃত্ব বা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রশাসনের নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নারীর সগৌরব উপস্থিতিই বলে দেয় তাদের অবস্থান এখন কতটা শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন বা নেতৃত্বের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, প্রায় ২০ বছর ধরে এ দেশের ক্ষমতার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত আছেন দুই নারী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নারী। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন ড.শিরীন শারমিন চৌধুরী। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছাড়াও নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও জয়ী হয়ে এসেছেন বিপুলসংখ্যক নারী। সরকারের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন নারী এবং এখনো কয়েকজন অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দেশের প্রথম নারী মেয়র হিসেবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ডা. সেলিনা হায়াত আইভী। ২০১৬ সালেও দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি মেয়র পদে নির্বাচিত হন। স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ,

উপজেলা পরিষদে নারীরা চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করছেন, যা নারী নেতৃত্বের একধাপ অগ্রগতি বলা যায়। নারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে এর বড়ো উদাহরণ বিশ্বখ্যাত *টাইম* ম্যাগাজিনের বিশ্বসেরা ১০ নারী নেত্রীর তালিকায় এবং পর পর কয়েকবার ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্থান অর্জন।

কর্মক্ষেত্রে নারী: শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে নারীরা এখন অনেক বেশি সচেতন তাদের অধিকার আদায়ে। নারীশিক্ষার প্রসার ও কর্মের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় নারীর কর্মস্পৃহা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ হারে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালতে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমান দক্ষতায় কাজ করছেন।

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীরা নিজ যোগ্যতায় জায়গা করে নিচ্ছেন। সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব পদে অনেক নারী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। বিসিএস ক্যাডার হিসেবে বিপুলসংখ্যক নারী দেশের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন সুনামের সঙ্গে। জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিন নারী। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা। দেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কবিতা খানম। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নাজনীন সুলতানা। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমাসহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রধান নির্বাহীর পদ ছাড়াও সকল স্তরে নারী নিজ যোগ্যতায় জায়গা করে নিচ্ছেন।

দেশের নারী সমাজের একটি বিরাট অংশ কাজ করছে তৈরি পোশাক খাতে (প্রায় ৮৫ শতাংশ)। তৈরি পোশাক দেশের প্রধান রপ্তানি খাত হওয়ায় এ সেক্টরের নারীরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নারীরা এখন শিক্ষকতা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, খেলাধুলা ও অন্যান্য পেশা ছাড়াও নির্দ্বিধায় যোগ দিচ্ছেন দেশের নিরাপত্তাবাহিনীতে। পুলিশ, আনসার, সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীতে তারা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে কাজ করছেন। তারা দায়িত্ব পালন করছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নেও (র‍্যাব)। অ্যাডিশনাল আইজি ফাতেমা বেগমের নেতৃত্বে নারীদের একটি চৌকস পুলিশ দল জাতিসংঘের শান্তি মিশনেও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করে এসেছে। আমাদের নারী পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিকের দায়িত্বও পালন করছেন। এছাড়া দেশের প্রথম নারী ছত্রীসেনা (প্যারাট্রুপার) হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জান্নাতুল ফেরদৌস আর দ্বিতীয় ছত্রীসেনা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন নুসরাত নূর আল চৌধুরী। নাবিক পেশায়ও যুক্ত হয়েছেন নারীরা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের নারীরা বেশ অগ্রসর হয়েছেন। ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করছেন। তনুজা রহমান মায়া, রোকসানা আক্তার শোভা, স্বর্ণলতা রায় ছাড়াও অসংখ্য নারী ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার হাতিয়ার হিসেবে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের সুমাইয়া আন্দালিব কাজি।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের নারী: বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ২০১৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে তিন বাঙালি নারী এমপি নির্বাচিত হয়ে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। রোশনারা আলী (দ্বিতীয় মেয়াদে), টিউলিপ সিদ্দিক (পূর্বে কাউন্সিলর), রূপা হক সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। রাজশাহীর মেয়ে পলা মঞ্জিলা উদ্দিন ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডসের আজীবন সদস্য বা ব্যারোনেস মনোনীত হন। সিলেটের মেয়ে আইরিন খান লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব হিসেবে কাজ করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ল অর্গানাইজেশন-এর মহাপরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চে গবেষক হিসেবে কাজ করছেন বাংলাদেশের মেয়ে তনিমা তাসনিম অনন্যা। সিলেটের মেয়ে স্বপ্নারা খাতুন ব্রিটেনে বাংলাদেশের প্রথম কোনো নারী জজ হিসেবে নিয়োগ পেয়ে ইতিহাস গড়েছেন। এছাড়া রাফিয়া চৌধুরী স্পেনে ব্রিটিশ দূতাবাসে থার্ড সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিও সিলেটের মেয়ে। নিসা সুরাইয়া আজিজ ব্রিটেনের জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল স্কাই নিউজে উপস্থাপক ও নিউজ প্রেজেন্টারের কাজ করে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি ১৯৯২ সালে 'পেজেন্টার অব দ্য ইয়ার' এবং ১৯৯৯ সালে 'বাংলাদেশ ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্স' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। পাবনার মেয়ে কনি হক বিবিসি টেলিভিশনের শিশুদের একটি অনুষ্ঠান 'ব্লু পিটার'-এর জনপ্রিয় উপস্থাপক। এটাতে তিনিই প্রথম এশিয়ান প্রেজেন্টার। বিদেশের মাটিতে সুনাম কুড়িয়েছেন কিক

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ৮ মার্চ ২০১৬ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'জয়া আলোকিত নারী ২০১৬' সম্মাননা প্রদান করেন – পিআইডি

বক্সার রোকসানা বেগম। ২০১১–২০১৪ মেয়াদে জাতিসংঘে সিডও কমিটির নির্বাচনে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের মেয়ে ইসমত জাহান। এদেশের মেয়ে আমিরাহ হক জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল পদে কাজ করছেন। তিনি পূর্ব তিমুরের বিশেষ প্রতিনিধি ও পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ সমন্বয় মিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আন্তর্জাতিক নারী পুলিশ সংস্থার এশিয়া অঞ্চলের (রিজিওন-১৫) সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের পুলিশ সুপার আমেনা বেগম। এছাড়া 'আইএডব্লিউপি ২০১২, ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপ অ্যান্ড রিকগনিশন' পুরস্কার অর্জন করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার আবিদা সুলতানা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ জানুয়ারি ২০১৭ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পুনঃ নির্বাচিত দেশের প্রথম নারী মেয়র সেলিনা হায়াত আইভীকে শপথবাক্য পাঠ করান – পিআইডি

স্বল্প পরিসরে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলেও এরকম আরো অসংখ্য বাঙালি নারী আছেন যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের যোগ্যতা ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিপুণভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের আছে এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ করা দুই নারী। নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজরীন। আরো আছে সালমা, সাবিনার মতো ক্রীড়াবিদ। ভারতের 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার পাওয়া ঝর্ণাধারা চৌধুরীর মতো নারীও আছেন আমাদের পাশে। আছে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলমান বাঙালি চিকিৎসক জোহরা বেগম কাজির প্রেরণা।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বের প্রশংসা

বাংলাদেশের নারী নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। ২০০৯ সালে মিসরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় বারাক ওবামা এবং ২০১১ সালে লিবিয়ার ত্রিপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশীল ও তরুণ সমাজের সঙ্গে নারী নেতৃত্ব নিয়ে মতবিনিময়কালে হিলারি ক্লিনটন উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের নারী নেতৃত্বের প্রসঙ্গ টেনে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'ইন্টিগ্রেটিং এ জেন্ডার পারসপেকটিভ ইনটু দ্য ওয়ার্ক অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস মিলিটারি ইন পিস কিপিং অপারেশন' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের বক্তারা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর সামনে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে এবং নারী নেতৃত্বে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে বলে দাবি করেন।

আজকের নারীর এ অগ্রযাত্রার পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি, যে কথাটা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বীরকন্যা প্রীতিলতা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের মতো ত্যাগী নারীদের অনুসরণ করেই বাংলাদেশের নারীরা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বীরপ্রতীক সেতারা বেগম ও তারামন বিবি ছাড়াও কাঁকন বিবি, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, আলেয়া বেগম, মিরাসি বেগম, আলমতাজ বেগম, মেহেরুন্নেছা, হালিমা খাতুন, আছিয়া বেগমের মতো হাজার হাজার নারী মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন আমাদের।

আজকের বাঙালি নারী সমাজের যে অগ্রযাত্রা তা ওই সব সংগ্রামী নারীরই বপন করা ফসল। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাদের এ প্রেরণা নিয়ে নারীরা আরো এগিয়ে যাবে, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে তাদের প্রতিভা আরো ব্যাপকভাবে এটাই একমাত্র চাওয়া।

লেখক : প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশে নারী দিবস পালনের ইতিহাস

বর্তমানে দিবসটি অ্যাসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ-এর ১৭টি অনুসংগঠন ও ১ হাজার ৩৫০ সদস্য সংস্থা এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ব্যাপকভাবে পালন করছে।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের বস্ত্র শিল্পের নারী শ্রমিকরা অধিকার আদায়ের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার স্বীকৃতি মেলে ১৯১১ সালের '৮ মার্চকে' আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণার মধ্যদিয়ে। তখন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে এ নারী দিবস পালন করে আসছে। তবে ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানালে সারাবিশ্বে তা একযোগে পালিত হতে থাকে।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশে প্রথম ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। সুফিয়া কামাল ১৯৬৭ সালের ৮ মার্চ মস্কোয় আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতিনিধি হিসেবে সে সম্মেলনে ভাষণদানকারী এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সাল থেকে জাতিসংঘের ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দিবসটি যথাযথভাবে পালন করে।

১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দিলে বাংলাদেশে তা ব্যাপকভাবে পালন শুরু হয়।

নিবন্ধ

নারীর উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভূমিকা

কমল চৌধুরী

কবির ভাষায় বলতে হয় 'এ বিশ্বের যা কিছু সুন্দর মহা চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী– অর্ধেক তার নর'। অর্থাৎ পৃথিবীতে এ যাবৎ মানব কল্যাণে সৃষ্টি যা কিছু সুন্দর অবদান চিরদিন অম্লান থাকবে–তার অর্ধেক কৃতিত্ব নারীদের এবং বাকি অর্ধেক পুরুষদের। নারী এবং পুরুষ যেন পরস্পরের পোশাকস্বরূপ। যেন নারী ও পুরুষ পরস্পরবিহীন অপূর্ণ। নারী একাধারে কন্যা, জায়া, জননী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নারী উন্নয়নে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন – পিআইডি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা কর্তৃক নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় নারী উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক অভিযাত্রা। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে নারী ও শিশু অধিকার এবং উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিবিধ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশনসহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্তকরণকে শক্তিশালী অনুঘটক এবং বহুমাত্রিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

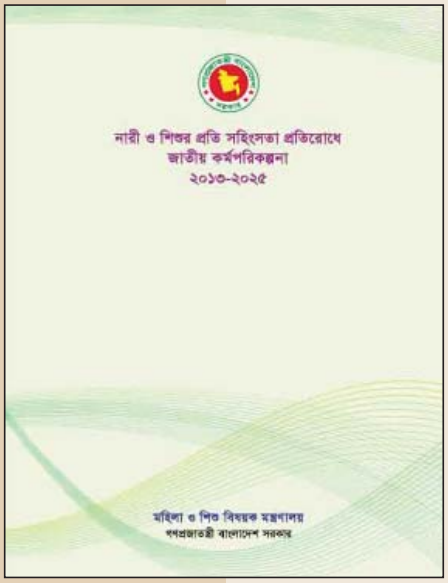

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রগতিশীল ও সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণসহ সার্বিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করাসহ শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু' এই রূপকল্প এবং 'নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ' এই মিশনকে সামনে রেখে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৬ সালে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমসমূহের আওতায় বিদ্যমান সকল ভাতার উপকারভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে হতদরিদ্র ১০ লক্ষ নারীকে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ এনজিওর মাধ্যমে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে অবস্থিত গার্মেন্টস সেক্টর, ৬৪টি জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা এবং ৬৫টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় কর্মরত ১.৮০৩ লক্ষ ল্যাকটেটিং মা'দের মাসিক ৫শ' টাকা হারে ২৪ মাসব্যাপী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে বাজেটে ৫ লক্ষ দরিদ্র মাকে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। দুস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জনপ্রতি ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৪৭৩টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৯.২০ লক্ষ জন। দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংসদ

সদস্যগণের সুপারিশক্রমে তাঁর নির্বাচনি এলাকায় দুস্থ ও অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ মার্চ ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন শেষে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন – পিআইডি

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মাল্টি সেক্টরাল প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সর্বশেষে ৬০টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিজ সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীদের স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশি সহায়তা, আইনি সহায়তা, মানসিক কাউন্সেলিং এবং আশ্রয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৩৫৯ জন নারী ও শিশুকে ওসিসিসমূহ থেকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। নির্যাতিত নারীদের দ্রুত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিসহ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪২১টি মামলার ক্ষেত্রে ১২৩৫টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মনো সামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তাকে জোরদার এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ঢাকা ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টার থেকে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মনো সামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়। গত বছর এই সেন্টার থেকে মোট ১০৩ জন নারী ও শিশুকে মনো সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর আইনগত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার কার্যক্রম বর্তমানেও চলমান রয়েছে। নির্যাতিত নারীগণ এ সেলের মাধ্যমে বিনা খরচে আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকেন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে নৃশংসতার শিকার নারী ও শিশুকে সরকার থেকে আর্থিক, পারিবারিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতিত নারীদের সহায়তার জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে পরিচালিত শেল্টার হোমে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের অনূর্ধ্ব ১ বছর আশ্রয় প্রদানসহ সকল ধরনের সুযোগ প্রদান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ময়মনসিংহ বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি

লেখক : সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

নিবন্ধ

কিশোর কবিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

মূলত বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকেই উৎসারিত উনিশশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের পর পরই তুমুল উল্লাসে কবি-শিশুসাহিত্যিকরা মুক্তিযুদ্ধের কিশোর কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন- যা ভাবলে অবাক হতে হয়। কিশোর কবিতা নিয়ে শিশুসাহিত্যিকরা আবিষ্ট হয়েছেন, ভেবেছেন পরম মমতায়, জেগে থেকেছেন, বিভোর থেকেছেন। এই কিশোর কবিতার আশ্রয়ে-অবলম্বনে কিশোর কবিতার লেখকরা পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন সফলতার নান্দনিক আঙিনায়।

শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা কিশোর কবিতা সর্বস্তরের পাঠকের মনে ভালোলাগার নিড়ানি বুলায়। কিশোর কবিতার দোলা-স্পর্শ মনকে কেমন যেন ছন্দের সম্মোহনে জড়িয়ে রাখে কোনো এক অজানা মায়ায়। আর কিশোর-লেখক-কবি-শিশুসাহিত্যিকরা কবিতার আবেগে, মুগ্ধতার আবেশে আচ্ছন্ন হতে থাকে সৃষ্টির মধুরতায়।

অতি সম্প্রতি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত, কিশোর কবিতার প্রাণপুরুষ কবি-শিশুসাহিত্যিক সুজন বড়ুয়ার কথাই যেন সকল কবি-শিশুসাহিত্যিকদেরও একান্ত মনের কথা। 'কবিতায় ব্যঞ্জনা সৃষ্টিই আমার কাছে বড়ো। তাই আমার কবিতা আবেগের সমুদ্র থেকে তুলে আনা দুরন্ত কিছু ঢেউ, মানুষের আকাশছোঁয়া প্রাণময় কলধ্বনি, সূর্যের উজ্জ্বল আলোকধারা, চাঁদের রুপোলি জ্যোৎস্নারাশি, টাপুরটুপুর বৃষ্টির মিষ্টি নূপুর ঝংকার আর বনানির অফুরন্ত সবুজ মায়ার অনাবিল সমাহার।'

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ছড়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর কবিতা রচনার ধারাবাহিকতা আজ অবধি উজ্জ্বলতর। মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তভেজা স্মৃতির ছন্দময় প্রকাশ বাঙ্ময় করে তুলছেন আমাদের দেশপ্রেমিক কবি-শিশুসাহিত্যিকরা তাদের অসংখ্য কিশোর কবিতায়। সেইসব ছন্দময় লেখার কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ– যাঁর ডাকে একাত্তরের গণজাগরণ, যাঁর ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির এক হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, সেই বীর বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণ প্রদানকে উপলক্ষ করে কবি লিখেন–

শত বছরের সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা–
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণ সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি;
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।
[স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো, নির্মলেন্দু গুণ]

শব্দের নিপুণ সংযোজনে, উপমার অলংকারে, বর্ণনার সৌন্দর্যে, ছন্দের সুষম ঝংকারে, মিল-মাত্রা-তালের কুশলতায়, ভাষার চমৎকারিত্বে কবি তাঁর ছন্দিত বুননে দেশমাতৃকার রূপ-কাহিনি তুলে ধরেন এভাবে–

আলুঘাটায় নেমে পায়ে/মাখব রাঙা ধুলো
আমায় দেখে খিলখিলিয়ে/হাসবে শিমুলগুলো।
বাঁশবাগানে আধখানা চাঁদ/থাকবে ঝুলে একা
ঝোঁপেঝাড়ে বাতির মতো/জোনাক যাবে দেখা।
ধানের গন্ধ আনবে ডেকে/আমার ছেলেবেলা
বসবে আবার দুচোখ জুড়ে/প্রজাপতি মেলা।
শত যুগের ঘন আঁধার/গাঁয়ে আজও আছে
সেই আঁধারে মানুষগুলো/লড়াই করে বাঁচে।
মনে আমার ঝলসে ওঠে/একাত্তরের কথা
পাখির ডানায় লিখে দিলাম/প্রিয় স্বাধীনতা।
[প্রিয় স্বাধীনতা, শামসুর রাহমান]।

বাঙালি মাত্রই সুন্দরের পূজারি। আনন্দঘন পরিবেশের ঐতিহ্যপূর্ণ চিরকালীন গর্বিত সংস্কৃতির ধারা লালন করে আসছে যুগ যুগ ধরে এই বাঙালি। এই সংস্কৃতি-শেকড়ের অস্তিত্ব রক্ষায় অমিত সাহসে জীবন বাজি রাখার স্বাক্ষর রেখেছে বার বার। সুন্দর আনন্দদিন, তথা সংস্কৃতি-শেকড়ের সন্ধানে কবির শানিত ভাষার দুর্দান্ত উচ্চারণ–

জলপাই রঙ য়্যুনিফর্মে, সবুজাভ হেলমেটে,
স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিক আমি, কর্মরত।
সৌন্দর্যের রাজধানী ঘিরে অসংখ্য বিরোধী বীর
অবস্থান নেয়, সুবিধাজনকভাবে একচেটে
আছে যার শিল্পরুচি, তাকে প্রয়োজন–ব্যক্তিগত
কিম্বা সার্বজন্য হরিষে বিষাদে– যে জন সুস্থির।
[সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ প্যারেড, রফিক আজাদ]।

মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ের ভয়াল দিনগুলোর নানান চিত্র নানানভাবে বিভিন্ন সময়

অস্ত্রসহ বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, ১৯৭১

কবির কবিতায় লিপিবদ্ধ হয় শব্দের ঝংকারে। চরণে চরণে মাঝেমধ্যে মধ্যমিলের মুন্সিয়ানায় সুবর্ণ অনুপ্রাসের অনুরণন ভালোলাগার দোলা জাগায় অন্তঃপুরে। জাতিসত্তার কবির বুদ্ধিদীপ্ত কিশোরকে সচেতন এবং অবগত করার প্রয়াস পান তাঁর অসাধারণ এই সৃষ্টিতে–

তোরাই মারিস তোরাই ধরিস/দোষের ভাগী আমরা
সব কিছুতে টান দে বলিস/'ইয়ে তো হ্যয় হামরা'।
বাত তো সহি, কিন্তু কহি/রাতের শেষে ফজরে
ইতিহাসের লিখন কি/পড়বে তোদের নজরে?
চাঁদ মরেছে ফুল ঝরেছে/কদমতলায় লাশ
কাল বসেনি আজ বসেনি/ইতিহাসের ক্লাস।
আগামীতেও বসবে কি-না/সেটাও সন্দেহে
রাত না হতেই আবার দ্যাখো/পাইকপাড়ায় কে?
[চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে, সৈয়দ শামসুল হক]।

প্রশিক্ষণরত কিশোর মুক্তিযোদ্ধাগণ, ১৯৭১

শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ৭ মার্চ-এর আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায় দেশজুড়ে। আবাল-বৃদ্ধ-বালক-বণিতার মাঝে মুহূর্তে জাগে জাগরণের ঢেউ। সবাই জেগে একই সাথে গেয়ে ওঠে–

আমার মাটি আমার চাই
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।
ছুটলো গুলি ছুটলো গোলা
নামলো দেশে দানো
শেখ মুজিবুর ডাক পাঠালেন
পাল্টা আঘাত হানো।
এবার লড়াই সবার লড়াই
মুক্ত স্বাধীন হবার লড়াই
এ শপথে জীবন বাজি
সব বাঙালি রুখতে রাজি।
তারপর একদিন– এল দিন সেই দিন
আর নই পরাধীন। পতাকাটা উড্ডীন
আজকের এই দিন বিজয়ের সেই দিন।
[এইদিন সেইদিন, আবু হাসান শাহরিয়ার]।

দেশমাতৃকার দুর্দিনে ঘরে বসে থাকতে পারেনি তার সন্তানেরা। সকলে নির্বিশেষে সকল ভয়-শঙ্কা উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দি মায়ের মুক্তির সংগ্রামে। তাদের অবদান কি কখনো ভোলা যায় ?–

কেমন করে ভুলি ওদের/কেমন করে ভুলি
তোমার আমার জন্য যারা/বুক পেতে খায় গুলি
ঘরের সোহাগ ফেলে বনের/বিপদ নিলে তুলি।
তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে/মুক্তি যারা আনলো বয়ে
টকটকে লাল রক্তে যারা/রাঙায় পথের ধুলি
কেমন করে ভুলি ওদের/কেমন করে ভুলি।
[শহীদ স্মৃতি, সুকুমার বড়ুয়া]।

স্বাধীনতার এসব বীর শহিদদের কখনো কি ভোলা যায়। ভোলা যায় না। ভোলা যায় না তাঁদের এ নিটোল অবদান। যে-কোনো কিছুর বিনিময়েই তাঁদের বুকের তাজা রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার মানও ক্ষুণ্ন হতে দেওয়া যায় না–

নির্মূল করে দিতে জাতিসত্তায়
ঘাতকেরা মেতেছিল গণহত্যায়।
লড়াই করেছে তারা কঠিন লড়াই
ইতিহাসে যার বেশি তুলনা তো নাই।
রক্ত ঝরিয়ে তবে এল স্বাধীনতা
লাখো মা'র কোল খালি বিষাদের ব্যথা।
ভুলব না শহীদের জীবনের দান
রাখবই স্বাধীনতা শহীদের মান।
[স্বাধীনতা রাখবই, হাসান হাফিজ]।

'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটির ব্যাপকতা এত যে বিশাল তার কোনো পরিমাপ হয়ত করা যাবে না। কবি-শিশুসাহিত্যিকদের এ নিয়ে একেক জনের প্রকাশের ভঙ্গি একেক রকম–

বোনের মান বাঁচাতে গিয়ে
জীবন দেয়াটি!
মুক্তিযুদ্ধ কী ?
এলএমজি-র নলে বসা
দোয়েল পাখিটি!
মুক্তিযুদ্ধ কী ?
শত্রুসেনা রুখতে গিয়ে
জীবন দেয়াটি !
মুক্তিযুদ্ধ কী ?
রক্তমাখা প্রাণপতাকা
উড়িয়ে দেয়াটি।
[মুক্তিযুদ্ধ, হোসেন মীর মোশাররফ]।

মুক্তিযুদ্ধ কী এবং কেন ? কবির কলমে শব্দের নিপুণ গাঁথুনি এবং উপমার অলংকারে, ছন্দের ঝংকারে সুরের ব্যঞ্জনার মাধুর্যে কখনো বা মোহমুগ্ধ হয়ে পড়তে হয়–

রাত্রি আমার বুকের মধ্যে/যুদ্ধ আমার ডানায়
কালো বুটের থমথমে ভয়/মরার হুকুম জানায়
আমরা ছিলাম চাষা ভুষো/বন বাদাড়ের ঝোপে
লুট হয়ে যায় স্বদেশ আমার/শিরদাঁড়া যায় কোপে।
দেশের জন্য রুখে দাঁড়াই/মৃত্যু কানায় কানায়
জন্মভূমি মাটি আমার/বাস্তুহারা বানায়।
[মুক্তিযুদ্ধ, শৈলেন্দ্র হালদার]।

স্বাধীনতার মন্ত্র বুকে নিয়ে বাংলা মায়ের হাজারো-লাখো সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে। স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার প্রত্যয়ে

অস্ত্র হাতে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার সাথে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১

মরণ-রণে পিছপা হওয়ার সে নয়। মায়ের হাতে বিজয় পতাকা এনে দেওয়ার যে শপথ করেছে– তা ভুললে চলবে কেন? মায়ের সে সন্তানেরা কথা রেখেছে। কিন্তু মায়ের অনেক বীর সন্তান মায়ের বীর অনেক খোকা ফেরেনি– মায়ের অবুঝ মন মানে না। অপেক্ষায় থাকে খোকা ফেরার।

'খোকন খোকন ডাকে মায়
আয়রে খোকন ঘরে আয়।'
খোকন গেছে যুদ্ধে
দুই হাত তার উর্দ্ধে।
'খোকন খোকন ডাকে মায়
আয়রে খোকন ঘরে আয়।'
অস্ত্র হাতে খোকন সোনা যুদ্ধ করে জয়
খোকন কেন ফিরল না আর, মায়ের মনে ভয়।
[খোকন ফিরে আয়, আমীরুল ইসলাম]।

বাংলা মায়ের সন্তানেরা তার মায়ের কোনোরূপ সুখ-শান্তির বিচ্যুতি ঘটুক তা সহ্য করতে পারে না। মায়ের সকল প্রকার বিপদ-সংকটে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অবলীলায়। দু'হাতে সরিয়েছে যত অন্যায়-অনিয়ম-অনাচারের জঞ্জাল।

বালক জানে না যুদ্ধের কোনো মানে
সে সাদা পায়রা আকাশে ওড়াতে জানে।
অথচ হিংস্র বর্বর পাকসেনা
চুকিয়ে দিয়েছে জীবনের লেনাদেনা।
বালক কখনো ফেরে না পেছন টানে
ওরাই দেশের স্বাধীনতা কিনে আনে।
[বালক জানে না, লুৎফর রহমান রিটন]।

সেই মুক্তিযোদ্ধা মায়ের সন্তানেরা আজীবন শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের কোনো তুলনা হয় না। তাঁরা মহান, তাঁরা বীর, তাঁরা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে, তাঁরা থাকবে সবার ওপরে–

তুলনা হয় না/মূর্খ এবং পড়ুয়া-বোদ্ধা
তুলনা হয় না/রাজাকার আর মুক্তিযোদ্ধা
মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকার
প্রশংসিত কে ? হবে সাজা কার ?
দেশের জন্যে লড়েছে যুদ্ধে/করেছে স্বাধীন– বীর সে
সবার ওপরে মুক্তিযোদ্ধা/তাকে তুলে ধরো শীর্ষে।
[সবার ওপরে মুক্তিযোদ্ধা, সৈয়দ আল ফারুক]।

যুগে যুগে বীর সেনানি মুক্তিযোদ্ধারা বাঙালির প্রেরণার উৎস, সামনে এগিয়ে চলার পথপ্রদর্শক। তাঁদের দেখিয়ে যাওয়া আলোর পথ অনুসরণ করে চলবে বাঙালি নিজেদের অনাগত পথ। তাদের প্রতি তাই লেখকের শ্রদ্ধার ডালি–

পূর্ব আকাশে বীর সেনারা একাত্তরের সূর্য
সকাল-বিকাল হৃদয় জুড়ে বাজায় রণতূর্য।
পাকসেনাদের হারিয়ে দিয়ে লড়ছে সোনার বাংলা
ফুল-ফসলে ভরছে দ্যাখো সবুজ কচি জাংলা।
আত্মত্যাগী বীর সেনারা একাত্তরের শক্তি
অহর্নিশি জানাই দ্যাখো শ্রদ্ধা এবং ভক্তি।
[একাত্তরের সূর্য, খালেক বিন জয়েনউদদীন]।

এই বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা কারো বাবা, ভাই, কাকা, মামা, আবার কারো সন্তান। তাদের বুকের তাজা রক্তে অর্জিত লাল-সবুজের এই পতাকা। কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় সেই পবিত্র পতাকার লাল আর সবুজে সেইসব শহিদের অস্তিত্ব খোঁজার সফল প্রয়াস লক্ষ করার মতো। কবি-শিশুসাহিত্যিকদের লেখায়–

সবুজ জমিনে টকটকে লাল সূর্যটা কে যে আঁকলো
এ নয় পতাকা, এতো এক ছবি কে যে তা সাজিয়ে রাখলো।
আকাশের কাছে রৌদ্রের আঁচে ছবিটা ঝলকে উঠছে
বাতাসের তোড়ে পত পত ওড়ে, যেন মুখে কথা ফুটছে
দেখি বার বার বিস্ময়ে আর পলক পড়ে না আমার
দেখতে দেখতে ছবি মনে আসে ভাই-বাবা আর মামার।
তারা গিয়েছিল সেই সে যুদ্ধে স্বাধীনতা নাকি আনতে
তাদের রক্ত মিশেছে এ লাল-সবুজ ছবির প্রান্তে।
[পতাকা আমার আমার আয়না, সুজন বড়ুয়া]।

শহিদের পবিত্র রক্তে কেনা স্বাধীনতা। পবিত্র সেই লাল-সবুজের পতাকা চিরকাল যেন শ্রদ্ধায়-স্মরণে–বরণে সমুন্নত রাখা যায় সে প্রত্যয় ধ্বনিত হয় কবির লেখায়–

যুদ্ধে যুদ্ধে জেনেছি আমরা নিজেদের পরিচয়
অন্যায় আর অবিচার রুখে মৃত্যু করেছি জয়।
স্বপ্ন রাঙানো পতাকা পেয়েছি সেই যে একাত্তরে
চিরকাল যেন আকাশের বুকে পত পত করে ওড়ে।
[পত পত করে ওড়ে, আহমাদ মাযহার]।

লাল-সবুজের এই পবিত্র পতাকা আমাদের বাঙালির চিরকালের গর্ব, আমাদের অহংকার– এই গর্ব-অহংকার নিয়েই প্রাণপ্রিয় পতাকা সমুন্নত রেখে আমরা চিরকাল বাঁচব, এগিয়ে যাব আগামীর পথে–

এক টুকরো সবুজ এবং/এক টুকরো লাল
এই আমাদের ঠিকানাটা/সেই কতকাল।
মুক্তি বায়ুর হাওয়ায়/হাওয়ায়/উড়ছি
এক টুকরো সবুজ এবং/লালের মাঝেই ঘুরছি।
[লাল সবুজ, জগলুল হায়দার]।

সেই লাল-সবুজের পতাকার জন্য মরণপণ লড়েছে দামাল ছেলেরা। সেই পতাকা অর্জনের কাহিনি নানাভাবে নানারূপে রূপায়িত হয়েছে কবি-শিশুসাহিত্যিকদের ভাষায়–

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ বিষাদমাখা দিনে
মৃত্যুকে ঠিক ভৃত্য করে হাত রাখি সঙ্গিনে।
শত্রুকে মেরে অবশেষে সূর্য ওঠাই ভোরে
জাগাই আবার নতুন সাড়া রুদ্ধ প্রাণের দোরে।

লাল-সবুজের পতাকাটা উড়িয়ে দিলাম শেষে
উদাম হাওয়ায় দুলতে থাকে আলোর বানে হেসে।
[জোনাক হয়ে নাচে, আহসান মালেক]।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানি, বাংলা মায়ের অকুতোভয় দামাল ছেলেরা মরণ-রণে লিপ্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে। সকল কিছু পিছু রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে দেশমাতৃকার টানে নিজেকে উৎসর্গ করেছে অবলীলায়–

যে কিশোর/ছেড়েছিল ঘর/দেখেছিল ঝড়/সারাদিন ভর
সে তো নির্ভয়/হয় দুর্জয়/সে স্বপ্নময়/বিস্তৃত হয়।
হয় নির্ভীক /ছোটে চারদিক/একদিন ঠিক/সেই সৈনিক
প্রতিজ্ঞা আঁটে/গঞ্জের হাটে/দূর খেয়াঘাটে/যুদ্ধের মাঠে
লড়ে প্রাণপণ/শত্রু নিধন/জেনেছিল রণ/দেশ প্রিয় ধন
কিশোর যে বীর/উঁচু রাখে শির/শান্তির নীড়/রচিবে সে বীর
সে কিশোর জানে/তারই অবদানে/দেশ-মা'র টানে/স্বাধীনতা আনে।
[যে কিশোর, আসলাম সানী]।

যে কিশোর, যে ছেলেটি দেশের কথা, মাতৃভূমির কথা ভেবে– নিজের

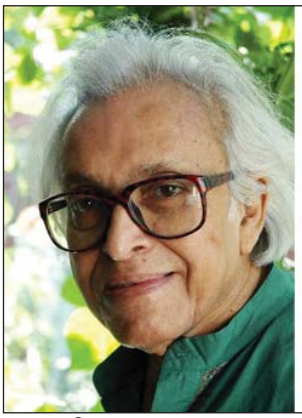
কবি শামসুর রাহমান

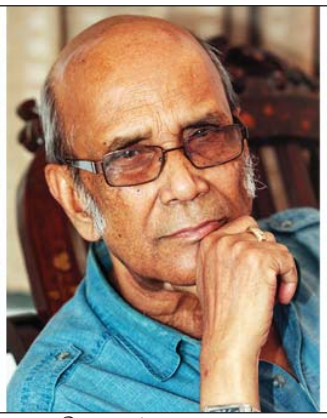
সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক

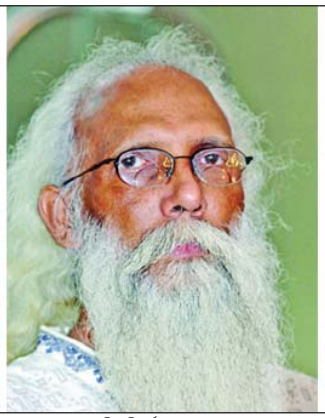
কবি নির্মলেন্দু গুণ

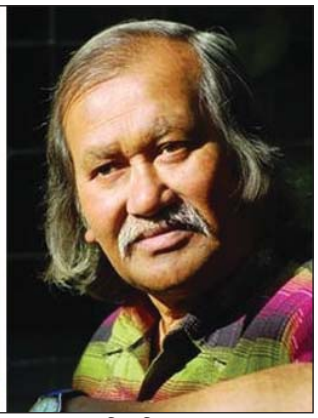
কবি রফিক আজাদ

অস্তিত্বের কথা ভেবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আত্মবলিদানে এদেশ স্বাধীন করেছে তাকে কোনো উপমায় সজ্জিত করা যায় না, কোনো বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায় না। চিত্রকল্প উপমা এবং শব্দের ঝংকারে লেখকরা তাদের লেখায় সেইসব যোদ্ধাদের তুলে ধরেছেন এভাবে–

একটি ছেলে পাগল ছেলে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরত
চোখ দু'টো তার চোখ যেন নয় ছবিতে বিমূর্ত।
সবাই তাকে বাসত ভালো সবার ছিল মিত্র
মুখ জুড়ে তার আঁকা ছিল স্বপ্নের মানচিত্র।
একাত্তরের পঁচিশে মার্চ আঁধার ঘেরা রাত্রে
হিংস্র কিছু জন্তু এল হাজার মাইল সাঁতরে।
পাগল মতোন সেই ছেলেটি এল যে আগ বাড়িয়ে
রক্তে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সামনে গেল দাঁড়িয়ে।
[সেই ছেলেটি, রহীম শাহ]।

একাত্তরের যুদ্ধে সেই ছেলেটি কারোর ভাই আবার কারোর বন্ধু। কবি-শিশুসাহিত্যিকরা তাদের লেখায় যুদ্ধকালীন আশয়-বিষয়কে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন–

আমার ভাইটি যুদ্ধের দিনে/কারোর শোনেনি মানা
বুকে হেঁটে হেঁটে শত্রু শিবিরে/একাই দিয়েছে হানা।
ভীষণ সাহসী, জেদীও ভীষণ/কারোর শোনেনি মানা
সাথিদের সাথে গুঁড়িয়ে দিয়েছে/শত্রুর আস্তানা।
যুদ্ধের শেষে সব ফিরে আসে/কিন্তু সে ফেরে নাই
আকাশের শত তারাদের ভিড়ে/রয়েছে আমার ভাই।
[আমার ভাই, দীপংকর চক্রবর্তী]।

পাক হানাদারের নৃশংসতার শিকার হয়েছে মানুষ, পশুপাখি সব–সব। লেখকরা সেই যুদ্ধের করুণ দৃশ্য এঁকেছেন তাদের কলমে–

এই গেরামে বিলের ধারে/বাঁশের ঝাড়ে বক থাকতো
হারিয়ে গেছে একাত্তরে/যখন এ দেশ রক্তাক্ত।
রাখতো মুখর একটি কোকিল/গ্রামটি মধুর আওয়াজে
খুন হয়েছে বক ও কোকিল/আর যাবে না পাওয়া যে।
বকটি আমার বন্ধু ছিল/কোকিল আমার ভাই
ওরাও শহীদ, ওদের নামে/স্মৃতির মিনার নাই।
[একাত্তরের পাখি, নাসের মাহমুদ]।

মায়ের প্রতি, দেশের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি তার অনুগত সন্তানেরা সব সময় সজাগ থাকে। বিন্দুমাত্র অন্যায়-অনিয়ম সহ্য করবে কেন তারা। তারা প্রতিবাদ করবে অবশ্যই। তাই প্রতিরোধের দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় সামনে। প্রয়োজনে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পিছপা হয় না মোটেও–

আমার মাটিতে সব হায়েনার/পুরনো লাঙলে কর্ষণ
করতে দেব না হাজার হলেও/বজ্র অগ্নিবর্ষণ।
আমার রক্তে নাচন লেগেছে/আমার কণ্ঠ রুদ্ধ
আমার জীবন ক্রান্তিকালের/আমার মানুষ ক্রুদ্ধ।
আমার আকাশে আমার ভূমিতে/আমার সামনে বন্ধন
আমার হৃদয় জানায় আজকে/যুদ্ধকে অভিনন্দন।
[যুদ্ধকে অভিনন্দন, ওমর কায়সার]।

অনিয়ম-অসংগতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যুদ্ধকে অভিনন্দন বাংলা মায়ের সন্তানেরাই করতে পারে। তারা জানে অধীনতার আঙিনায় থেকে অনিয়মের শৃঙ্খল অতিক্রম করা দুরূহই বটে। সংগত কারণেই স্বাধীনতার প্রদীপ্ত পরিবেশের আলোয় আলোকিত হতে চায় তারা। তাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, স্বাধীনতা ছাড়া সব কিছুই অসম্ভব।

স্বাধীনতা ছাড়া সূর্য ওঠে না/ফুলেরা ফোটে না
পাখিরা গায় না গান,
রাস্তার বাঁকে তড়পাতে থাকে/তুখোড় নওজোয়ান।
স্বাধীনতা ছাড়া ফসল ফলে না/জীবন চলে না
হাঁটুরে ফেরে না বাড়ি,
বাতায়ন পাশে দোলে না বাতাসে/ গুবাক তরুর সারি।
স্বাধীনতা ছাড়া মনের আকাশ/হয় না বিকাশ

কে যেন পেছনে তাড়া,
করে দিন রাত– হয় না প্রভাত/সূর্যের হাত ছাড়া।
[স্বাধীনতা ছাড়া, এমরান চৌধুরী]।

এই প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে রয়েছে সীমাহীন ত্যাগ। সকলেই কেউ না কেউ স্বজন হারিয়েছে, হারিয়েছে বাবা-মা, ভাইবোন, কাকা-কাকি, মামা-মামি হয়তবা আরো অন্য কেউ–

টুনু হারিয়েছে প্রিয় আব্বুকে রিমু হারিয়েছে কাকু
এই বুঝি ওরা ফিরে এল বলে মন করে আঁকুপাঁকু।
মুমু হারিয়েছে বড়ো ভাইয়াকে চিনু মিনু বড়ো বোন
ফিরে এসে ওরা বলবে কখনো কাছে আয়,ওরে শোন।
শোকে বিহ্বল নিঝুম প্রকৃতি পাখিরা গায় গান
খোকাটা ফিরবে আনচান করে মায়ের ব্যাকুল প্রাণ।
এত শোক ব্যথা পেছনে সরিয়ে মুছে ফেলে ব্যাকুলতা
রক্তে রাঙানো বর্ণে এসেছে প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা।
[প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা, জসীম মেহবুব]।

সেই স্বাধীনতাকালীন সময়ের চিত্র ছিল খুবই ভয়ংকর। নিরস্ত্র বাঙালির উপর নির্যাতনের মাত্রা ছিল বিভীষিকাময়। বাড়িঘর, দোকান-হাটবাজার, শহর-বন্দর কোথাও ছিল না বাদ। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে হানাদারবাহিনী–

পুড়লো আমার প্রিয় শহর পুড়লো আমার বাড়ি
দিগবিদিকে ছুটল সবাই সঙ্গে বাসন-হাঁড়ি
ছাই হয়েছে সবুজ স্বদেশ ফুল ফসলের মাঠ
একাত্তরের দুঃখগাথা সব করি আজ পাঠ।
দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ হলো বর্গি এল দেশে
সোনার ছেলে যুদ্ধে গেল দেশকে ভালোবেসে।
[একাত্তরের স্মৃতি, ইকবাল বাবুল]।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের গল্পগাথায় বাস্তব চিত্র সন্নিবেশিত করার প্রয়াসী হয়েছে অনেক সুধী–কবি, লেখক সমাজ। ছন্দের নন্দিত বাঁধনেও শিশুসাহিত্যিকরা বেঁধেছেন সেই সমস্ত কাহিনি–

ফটাস ফটাস গুড়ুম গুড়ুম সামনাসামনি যুদ্ধ
যে যেখানে থাকে থাকুক পথ সকলের রুদ্ধ।
রুদ্ধশ্বাসে বীর বাঙালি আল্লাহ-খোদার নাম নেয়
সাহস আসে বুকের ভেতর, এগিয়ে চলে সামনে
আঘাত পেয়ে দত্যিগুলো লুকিয়ে পড়ে গর্তে
মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে আর আসেনি লড়তে।
দত্যিবিহীন স্বাধীন ভূমি, বাতাস হলো মুক্ত
মানচিত্রে নতুন দেশের নাম হয়েছে যুক্ত।
একাত্তরের গল্পগাথায় মিথ্যে নেই এক রত্তি
সত্যি সত্যি নেমেছিল মানুষরূপী দত্যি।
[একাত্তরের গল্পগাথা, রাশেদ রউফ]।

সেই থেকে আমাদের দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। সকল অপশক্তির বিনাশের মাধ্যমে নির্ভাবনার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। এমন দেশ কি সুজলা-সুফলা-সুন্দর না হয়ে পারে?

আমার দেশের ঘুঘু দোয়েল
ময়না টিয়া শালিক কোয়েল
টুনটুনিও গুনগুনিয়ে
বলে মজার কথা–
আমার দেশের পাখপাখালির
আছে স্বাধীনতা।
আমার দেশে ফুল পাখি আর নদী
সারাটাকাল এমন করেই চলতে পারে যদি
স্বাধীনতা নিয়ে–
এমন দেশের হয় তুলনা
অন্য কিছু দিয়ে ?
[আমার দেশ, স. ম. শামসুল আলম]।

স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা-রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে বীজ বপন করেছেন, কিশোর কবিতার কবি তাঁর কবিতায় সেই চিত্র এঁকেছেন অতি নিপুণ ও যত্নসহকারে–

স্বাধীনতা মানে অমর কাহিনী/কবি তার মুজিবুর
স্বাধীনতা মানে অবিনাশী গান/মুজিবের দেয়া সুর
স্বাধীনতা মানে গোলাপ ফোটানো/শৈল্পিক সুষমায়
অমর শিল্পী শেখ মুজিবের/বিভূষিত মহিমায়।
[অন্য স্বাধীনতা, রফিকুর রশীদ]।

লাখো শহিদের রক্ত দামে অর্জিত স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বাঙালির গর্বের ধন। এই অর্জিত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখতে বাংলা মায়ের বীর সন্তান বদ্ধপরিকর। কোনোরূপ কালো ছায়া, কিংবা নোংরা কোনো প্রভাব দেশমাতৃকার উপর বিস্তার লাভ করুক তা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। যে-কোনো কিছুর মূল্যে এই গর্বিত অর্জন সমুন্নত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে মায়ের সন্তান–

আমি তখন চমকে ভাবি থমকে যাবে চলা?
তা হবে না মুক্ত থাকুক আমার চলা বলা।
শপথ ধরে লড়বো আমি গুলতি নিশান করে
রক্তে পাওয়া স্বাধীনতা রাখবো মায়ের ঘরে।
একাত্তরের ছেলে আমি একাত্তরের ছেলে
সবুজ হাওয়ায় ভাসবো অবাধ খুশির ডানা মেলে।
[একাত্তরের ছেলে, আবুল কালাম বেলাল]।

মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে এ দেশ। পরাজিত বর্ণচোরারা কিন্তু এদেশের স্বাধীনতা, ভাষা, সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পারেনি আজও। মেনে নিতে পারেনি তাদের নিজেদের মতো করে। তাইতো এ স্বাধীন দেশের পতাকাকে বার বার কলঙ্কিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত তারা। কবি তাঁর কবিতায় তাই নতুন আরেক মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যয় ঘোষণা করেন–

একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে-
শত্রু তাড়িয়ে পেয়েছি বিজয় মুক্তিযুদ্ধ লড়ে।
পেয়েছি বিজয় তাই কি সবাই খুশিতে হয়েছি তৃপ্ত!
তবু কেন রোজ ভয়-শঙ্কায় কেঁপে ওঠে এই চিত্ত?
মুক্তিযুদ্ধ চলছে চলবে দুঃখ মোছার জন্য
ভুখা গরিবের মুখে দিতে হবে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন
দুষ্টের গুলি-বোমার আওয়াজে হারাবো আমরা খেই?
তাদের রুখতে নতুন যুদ্ধ চলছেই চলবেই।
[নতুন মুক্তিযুদ্ধ, অরুণ শীল]।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক অত্যাচার ও আক্রমণ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। কিশোর কবিতার লেখকরাও এই করুণ নির্মম ঘটনার বয়ান তাঁদের লেখায়-কবিতায় তুলে ধরেছেন নানান সময়–

কাঁপছে আকাশ বাতাস পানি কাঁপছে পুকুর ঘাট
জ্বলছে আগুন পথে পথে বিরান হলো মাঠ
মৃত্যুপুরী বধ্যভূমি মানুষ মরে শেষ
মুক্তিসেনা বীরের মতো হারতে দেয়নি দেশ।
[দেশের কথা বুকে, আখতারুল ইসলাম]।

মহান স্বাধীনতা নিয়ে একাত্তরের যুদ্ধকালীন চিত্র-কাহিনি প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশের কিশোর কবিতার পরিসর-পরিমণ্ডল অত্যন্ত বিশাল। ফুলে-ফলে, গৌরবে-সৌরভে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিশোর কবিতার নান্দনিক চলা সুনিপুণ-মসৃণ। কিশোর কবিতা লেখকরাই তার নন্দিত-বন্দিত-ছন্দিত স্রষ্টা।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, প্রেস ক্লাব, চট্টগ্রাম

নিবন্ধ

বাংলা চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর

আপন চৌধুরী

মহান স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন এবং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মহত্তম অধ্যায়। স্বাধীনতার ৪৬ বছরে অনেক পরিচালক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এর কোনোটা শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে, কোনোটা হয়নি। কাঁচা পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসা পাকিস্তানি সৈন্য ভর্তি ট্রাকে লুকিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের বোমা বর্ষণ, অসহায় মা-বোনদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন, অবশেষে মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের দৃশ্যই সাধারণত দেখানো হয় মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধকালীন দৃশ্যপট ভেসে ওঠে ইতিহাসের পাতায়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্য দেশ বরেণ্য পরিচালক জহির রায়হান নির্মাণ করেন *স্টপ জেনোসাইড*। এদেশে গণহত্যা কেমন হয়েছিল তার সচিত্র প্রতিবেদন *স্টপ জেনোসাইড*। এর নির্মাণশৈলীর শিল্পগুণ হয়ত কেউ বিচার করেনি। কারণ বাঙালির গণহত্যার সেই বীভৎস চিত্রের কোনো নান্দনিক বর্ণনা কলমে লেখা যায় না। এগুলো সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চিত্রায়িত।

যুদ্ধের ভয়াবহতা, প্রাণ বাঁচানোর আশায় অসহায় মানুষের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণের চিত্র বাস্তব ও মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে এ ছবিতে। নির্মাণশৈলীতে নির্মাতা এতে প্রায় স্পর্শ করে ফেলেছিলেন প্রামাণ্যচিত্রের প্রবাদ পুরুষ রবার্ট ফ্লাহার্টিকে। জহির রায়হান বিষয়ের মহত্ত্ব এবং মানবিকতার জয়গানে তাকেও যেন ছাড়িয়ে গেলেন। চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের মতে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখন পর্যন্ত এটিই আমাদের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কীর্তি।

স্টপ জেনোসাইড তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। জহির রায়হান *এ স্টেট ইজ বর্ন* নামে আরো একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রাম আর ৯ মাস যুদ্ধের মাধ্যমে যে মানচিত্র হয়েছিল সেটিই *এ স্টেট ইজ বর্ন*। এটি তৈরি করেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। এছাড়া আলমগীর কবির তৈরি করেন প্রামাণ্যচিত্র *লিবারেশন ফাইটার্স*।

চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান, ছবি : স্টপ জেনোসাইড

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সাউন্ডট্র্যাকে ওভারল্যাপ করে এ ছবিতেই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। বাবুল চৌধুরীর প্রামাণ্যচিত্র *ইনোসেন্ট মিলিয়নস* –এর বিষয়বস্তু নারী ও শিশুদের উপর পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বর্বরতা।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নিয়ে প্রথম সফল চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন চাষী নজরুল ইসলাম। যুদ্ধকালীন সম্পূর্ণ চিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরে তাদের শিহরিত করেন *ওরা ১১ জন* (১৯৭২) ছবি দিয়ে।

১১ জন মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, সংগঠিত হওয়া, যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে এই ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। পরিসমাপ্তি হয় শত্রুবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও

ওরা ১১ জন চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

বিজয় উল্লাসের মাধ্যমে। একই বছর মুক্তি পায় সুভাষ দত্তের *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২) । এর প্রেক্ষাপট ছিল ব্যতিক্রম। ছবির অভিনেতা যুদ্ধে যেতে পারে না, অসহায়ের মতো লক্ষ করে মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা। একই সময়ে মুক্তি পায় আনন্দের *বাঘা বাঙালি* (১৯৭২) ও মমতাজ আলীর *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২)। পরের বছর আলমগীর কবির নির্মাণ করলেন *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩)। এটি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কাহিনি চিত্র হলেও এতে প্রামাণ্য ও ফিকশনের সংমিশ্রণে সফল হন তিনি।

মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন দেশে লুটতরাজসহ নানা ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রকাশ পেল খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩) ছবিতে। একই বছর মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে আলমগীর কুমকুম নির্মাণ করলেন *আমার জন্মভূমি* (১৯৭৩), কবির আনোয়ার নির্মাণ করলেন *স্লোগান* (১৯৭৩)। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও চোরাকারবারীদের সমসাময়িক চিত্র তুলে ধরে নারায়ণ ঘোষ মিতা নির্মাণ করলেন *আলোর মিছিল* (১৯৭৪)। এর মাধ্যমে পরিচালক দর্শকদের মনে দেশপ্রেমের নতুন দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। একই বছর চাষী নজরুল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দ্বিতীয় চলচ্চিত্র *সংগ্রাম* (১৯৭৪) মুক্তি পায়। এস আলী তৈরি করেন *বাংলার ২৪ বছর* (১৯৭৪)। হারুন-অর-রশিদ *মেঘের অনেক রং* (১৯৭৬) নির্মাণ করে দর্শকদের অনেকের মনেই রং ছড়িয়েছেন। আব্দুস সামাদ তৈরি করেন *সূর্যগ্রহণ* (১৯৭৬), *সূর্যসংগ্রাম* (১৯৭৭)।

এরপর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শহীদুল হক নির্মাণ করেন *কলমীলতা* (১৯৮০), কাজী হায়াৎ *সিপাহী* (১৯৯৩)। হুমায়ূন আহমেদ *আগুনের পরশমনি* (১৯৯৪) নির্মাণ করে নন্দিত হন। ১৯৭১ সালে আমেরিকান সাংবাদিক লিয়ার লেভিন বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাদের কার্যক্রমের উপর ২০ ঘণ্টার দৃশ্যধারণ করেছিলেন।

স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদকে সঙ্গে নিয়ে তারেক মাসুদ সেগুলো উদ্ধার করে সম্পাদনার পর ৮০ মিনিট দৈর্ঘ্যের *মুক্তির গান* (১৯৯৫)

চলচ্চিত্রটি তৈরি করেন। তারেক মাসুদের অনেক শ্রম ও ঘাম দিয়ে গড়া *মুক্তির গান* এখনো অনেককে নাড়া দেয়। এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক মহৎ প্রামাণ্য দলিল এবং প্রথম রঙিন চিত্র। তারেক মাসুদ *মাটির ময়না* (২০০২) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন। এটাই বাংলাদেশের প্রথম অস্কারের জন্য মনোনীত চলচ্চিত্র।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *হাঙর নদী গ্রেনেড* অবলম্বনে চাষী নজরুল ইসলাম তার তৃতীয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৯৭) নির্মাণ করেন। এটি পুরস্কৃত হয়। পরে হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করেন *শ্যামল ছায়া* (২০০৪) নামে চলচ্চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাস অবলম্বনে নাসির উদ্দিন ইউসুফ নির্মাণ করেন *গেরিলা* (২০১১)। দেশে-বিদেশে এই ছবিটির পুরস্কার অর্জন এবং দর্শক আগ্রহের কথা প্রায় প্রত্যেকেরই জানা।

মূলধারার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি আশার আলো দেখাচ্ছে বিকল্পধারার চলচ্চিত্র। অনভিজ্ঞ, অসচ্ছল একদল মেধাবী উদ্যমী তরুণ প্রায় পরিত্যক্ত ১৬ মি.মি. ক্যামেরা আর প্রজেক্টর সম্বল করে এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই এদের প্রধান সম্বল। এর মধ্যেই তাদের অনেকে ছিনিয়ে এনেছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। মোরশেদুল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি *আগামী* (১৯৮৪)। এটি ১৯৮৫ সালে দিল্লি চলচ্চিত্র উৎসবে 'রৌপ্য ময়ূর' লাভ করে। তার পরিচালনায় *আমার বন্ধু রাশেদ* (২০১১) যে পরিমাণ সাড়া জাগিয়েছে তাতে করে মুক্তিযুদ্ধের ছবির প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ আরো বেড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে নির্মিত যেসব চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আমাদের চেতনায় ও জাগরণে মুক্তিযুদ্ধের জয়গান করেছে তার মধ্যে রয়েছে– আলমগীর কবীরের *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে* (১৯৭২), নাসির উদ্দিন ইউসুফের *৭১-এর যীশু* (১৯৯৩), তানভীর মোকাম্মেলের *নদীর নাম মধুমতি* (১৯৯৪), *চিত্রা নদীর পাড়ে* (১৯৯৯), *স্মৃতি ৭১* (২০১১), খান আতাউর রহমানের *এখনও অনেক রাত* (১৯৯৭), কাওসার চৌধুরীর *সেই রাতের কথা বলতে এসেছি* (২০০১), তৌকির আহমেদের *জয়যাত্রা* (২০০৪), শহীদুল ইসলাম খোকনের *লাল সবুজ* (২০০৫), মোরশেদুল ইসলামের *খেলাঘর* (২০০৬), শাহরিয়ার কবিরের *যুদ্ধাপরাধ ৭১*

(২০০৮), চাষী নজরুল ইসলামের *মেঘের পরে মেঘ* (২০০৭), *ধ্রুবতারা* (২০০৮), ফখরুল আরেফিনের *আলবদর* (২০১১), সাদেক সিদ্দিকীর *হৃদয়ে ৭১* (২০১৪), শাহ আলম কিরণের *৭১-এর মা জননী* (২০১৪), মনসুর আলীর *সংগ্রাম* (২০১৫), মুশফিকুর রহমান গুলজারের *লাল সবুজের সুর* (২০১৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এখনকার তরুণরা অনেক শিক্ষিত এবং চলচ্চিত্র বিষয়টি তারা খুব ভালো বোঝে। সুখবর হলো সরকার চলচ্চিত্রকে শিল্প ঘোষণা করেছে ২০১২ সালে এবং চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে ২০১৩ সালে। এর মাধ্যমে নির্মাতারা সমৃদ্ধ করছে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকে। দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কালচার তথা চলচ্চিত্র অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার উপর। যদি আমরা স্বাধীনতার চেতনায় দেশকে সাজিয়ে তুলতে পারি তবে শুধু চলচ্চিত্র নয় দেশের সংস্কৃতিও সোনার বাংলার মতোই সুন্দর হবে।

বিদেশিদের সেলুলয়েডের ফিতায়ও বন্দি হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্র নির্মাতা শুকদেব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তৈরি করেন *নাইন মান্থস অব ফ্রিডম* (১৯৭১)। ভারতীয় পরিচালক আইএস জোহর নির্মাণ করেন *জয় বাংলা* (১৯৭২)। ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল পাগডার উদ্যোগে নির্মিত হয় *মেজর খালেদ'স ওয়ার* (১৯৭২)। জাপানি চলচ্চিত্রকার নার্গিস ওলিমা তৈরি করেন *বাংলাদেশ স্টোরি* (১৯৭২)। মার্কিন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা বই অবলম্বনে ভারতের গীতা মেহতা *ডেটলাইন বাংলাদেশ* (১৯৭২) এবং দূর্গাপ্রসাদ *দুরন্ত পদ্মায়* (১৯৭২) চিত্রিত করেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ টিভি নেটওয়ার্ক চ্যানেল ৪-এর উদ্যোগে গীতা সায়গল ও ডেভিড বার্গম্যান তৈরি করেছেন *ওয়ারক্রাইমস ফাইল*। ভারতীয় নির্মাতা মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত করেন *যুদ্ধশিশু* (২০১২) নামে বীরাঙ্গনাদের জীবনকাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র। এটি বেশ প্রশংসিত হয়। বিশ্ব চলচ্চিত্রের শত বছর পার হয়েছে অনেক আগেই। *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) থেকে ধরলে আমাদের চলচ্চিত্রের বয়স ৬০ বছর। আমাদের সামনেও আছে অমিত সম্ভাবনা। আছে হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্য আর সাংস্কৃতিক ভিত্তি এবং মুক্তিযুদ্ধে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। আমরা আশাবাদী আমাদের সৃজনশীল নির্মাতাদের নিয়ে। যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তৈরি করবে বিশ্বমানের আরো চলচ্চিত্র।

লেখক: চলচ্চিত্র গবেষক

বৈপরীত্য

ফকির জসীমউদ্দিন

দেহটি সটান হয়ে পড়ে ছিল উত্তর-দক্ষিণ হয়ে। কোনো নড়চড় নেই। কোনো রাগ-শব্দও নেই। মাথা ও বুক নিম্ন দিকে, পেছনে বিপরীত দিকে কোমরের ওপর হাত দুটি দড়ি দিয়ে বাঁধা। পুলগোড়ায় অসমতল ভূমিতে খানিকটা নামায় খালের পানির কিনারায় দেহটি নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। ইদানীং এ পুল দিয়ে কেউ খুব জরুরি না হলে আসা-যাওয়া করে না। তিন মাসের অধিককাল হয়ে গেল কেউ পুলটি মেরামত করতেও এগিয়ে আসেনি। কাঠের পুল। পুলের মাঝখানে বেশকিছু তক্তা নড়বড়ে। যে-কোনো সময় পাবলিক পুল পার হতে গিয়ে নরম তক্তায় পা পড়লে নিচে খালের পানিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিকটেই পুটিয়া বাজার। শনি ও মঙ্গলবার হাট বসে এ বাজারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই এ বাজারে পাওয়া যায়। শনিবার দিন গরুর হাট বসে। পূর্বদিক থেকে যারা এ বাজারে যাতায়াত করে তাদেরকে এ কাঠের পুলটি পার হতে হয়।

কাঠের পুলের অদূরে খানিকটা পশ্চিম দিকে পাকবাহিনী ক্যাম্প

বসিয়েছে কদিন আগে। যে বিল্ডিংটিতে বসে সরকার থেকে ডাক আনা লোকেরা বাজারের খাজনা তুলত সে বিল্ডিংটি এখন পাকবাহিনীর ক্যাম্প। পাকবাহিনী এসেই বিল্ডিংটির চেহারা পুরো পরিবর্তন করে দিয়েছে। সমস্ত বিল্ডিং-এর গা-গতরে জলপাই রংয়ের আঁকিবুকি। পাশে গরুর হাটের উত্তর-পশ্চিম কোণে অনেক বয়সি গাছগুলোর গোড়ার কাছে খালি জায়গায় নুতন টিন দিয়ে তৈরি করা দুচালা ঘরে রাজাকারদের থাকার ব্যবস্থা করেছে পাকবাহিনী। যত ভালো-মন্দ খবরাখবর আশপাশের এলাকায় আছে তা অক্ষরে-অক্ষরে খবর নিয়ে পাকবাহিনীর কানে পৌঁছিয়ে দেয় রাজাকারবাহিনী। তাদের মধ্যে সূর্যা রাজাকার আর মতি রাজাকার কমান্ডারের দায়িত্ব নিয়ে অন্য রাজাকারদের নিয়ন্ত্রণ করে নিজ কর্তৃত্বে । মতি রাজাকারের বাড়ি পুটিয়া বাজার থেকে মাইল দেড়েক উত্তর দিকে সৈয়দনগর। সৈয়দনগরে একাধিক বংশের লোকদের বাস। খন্দকার, মীর এবং ভূইয়াদের মধ্যে খন্দকারদের দাপটই এ এলাকায় বেশি। মতি রাজাকারের বাড়ি এ এলাকার উত্তরপাড়ায়।

উত্তরপাড়ার জব্বার মাস্টারের নাম চারদিকে রবরব। তিনি কোনো স্কুল মাস্টার নন। লেখাপড়া ও তেমন ডিগ্রিধারী নন। কিন্তু বুদ্ধি-জ্ঞানে আর ধর্ম চিন্তা ও চর্চায় অনেক ভালো দেখে এলাকার মানুষজন উনাকে মাস্টার বলে ডাকে। জব্বার মাস্টারের আরেকটা বিশেষ গুণ হলো উনি কাউকে ভয় পান না। খুবই সাহসী তিনি। বিঘা চারেক ধানী জমিই তার সম্বল। আর আধা বিঘার ভিটি বাড়ি। সে বলে তিনি কাউকে জমা খরচ দিয়ে চলেন না। কিন্তু সেদিক দিয়ে রফিক খন্দকার খুবই শক্তিশালী। অর্থে-স্বত্বে স্বামীত্বে রফিক খন্দকারের প্রাধান্যতা এ এলাকায় পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে। এক নাগাড়ে তিনবার চেয়ারম্যানের কাজ করে আসছেন পর পর। তার পেশীশক্তিকে যমের মতো ভয় করে এ এলাকার মানুষজন। শুধু এ এলাকা নয়। পুটিয়া বাজারের আশপাশের এলাকায়ও তার প্রভাব কম নয়। লাঠি আর অর্থের জোর বেশি থাকার কারণে এলাকার লোকজন খুবই হুজুর হুজুর করে। কিন্তু জব্বার মাস্টারের কথা আলাদা। জব্বার মাস্টার ডেমকেয়ার রফিক খন্দকারকে। মনের জোরের চেয়ে গায়ের জোরও এখনো অনেক আছে এই প্রৌঢ় বয়সে। পাঁচ ও সাত মাইল হেঁটে বেড়ানো জব্বার মাস্টারের জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। সেদিন বাজার হাট করে পুটিয়া বাজার থেকে হেঁটে আসতেই রফিক খন্দকারের সাথে দেখা হয়ে গেল জব্বার মাস্টারের। তখন মাগরিবের আজানের সময়। রফিক খন্দকার খানিকটা রোখ চাপিয়েই রুঢ় কণ্ঠে জব্বার মাস্টারকে ডেকে বলল, 'দাঁড়াও, তোমার সাথে কথা আছে।'

জব্বার মাস্টার তাড়াহুড়া ভাব দেখিয়ে বলল, 'এখন সময় নাই। মাগরিবের আজান দিয়ে দিছে। পরে কথা শুনব।'

এ কথা বলে জোর পায়ে হেঁটে চলে গেল বাড়ির দিকে।

রফিক খন্দকার খানিকক্ষণ জব্বার মাস্টারের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভাবল, কাজটা তুমি ভালো করনি জব্বার মাস্টার। আমার নাম রফিক খন্দকার, আমি যা ভাবি, তাই করি। আমি কাউকে পরোয়া করি না। তোমাকে আমি দেখে নেব জব্বার মাস্টার।

রফিক খন্দকার এমনটা ভেবে খানিক দ্রুত পায়েই হেঁটে চলে আসে পুটিয়া বাজারে রাজাকার ক্যাম্পে। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত। এ সময়টায় হাটবার ছাড়া পুটিয়া বাজারে কেউ থাকে না পাকবাহিনীর ভয়ে। কিন্তু সেই ভয় রফিক খন্দকারের নেই। রফিক খন্দকার এলাকায় নামিদামি মানুষ এটা সবাই জানে। তিনি খানিকটা আনন্দ মনেই রাজাকার ক্যাম্পে ঢুকে সূর্যা রাজাকারকে জেদ দেখিয়েই বলল, 'তোমরা কী কর দেশের জন্য। চারদিকে মুক্তিবাহিনী চরকির মতো ঘুরতেছে। রাত্রিবেলা অস্ত্র নিয়ে তোমাদের ক্যাম্পে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতিও নিতেছে। তোমরা কিছুই জান না।'

সূর্যা রাজাকার বলল, 'মুক্তিবাহিনীর কোনো খবর আছে দাদা?'

আছে মানে ? উত্তরপাড়ার জব্বার মাস্টারের বাড়িতে গেলেই সবকিছু টের পেয়ে যাবা। তার পোলা ছাত্তার মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিছে। এ এলাকায়ই আছে ছাত্তার। রাত-নিশুতে জব্বার মাস্টারের সাথে দেখা করতে আসে সে।

সূর্যা রাজাকার বলল, তাই নাকি? তাহলে চাচা আপনি চলে যান। আমরা আজ রাতেই জব্বার মাস্টারের বাড়ি হানা দেব।

রফিক খন্দকার একটু মুচকি মুচকি হাসির ভাব ধরে চলে গেল বাড়ির দিকে।

সূর্যা রাজাকার মনে মনে ভাবল, এখনই প্রতিশোধ নেওয়ার সময়। বিগত সময়ে একমাত্র জব্বার মাস্টারের জন্যই এলাকায় কোনো কিছু করতে পারি নাই। কোনো খায়েশই মজাতে পারি নাই। এবার চলবে খেলা। এর প্রতিশোধ আমি নেবই।

পাশেই মতি রাজাকার অনেকক্ষণ ধরে সূর্যা রাজাকারের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভাবল, দোস্ত মনে হয় শিকার ধরার লাইগ্যা এখন খুবই চিন্তাভাবনা করতেছ। এমনটা ভেবে মতি রাজাকার হাস্যোজ্জ্বল মুখে সূর্যা রাজাকারের দিকে তাকিয়ে বলল, দোস্ত, তুমি কিছু ভাবছ, কোনো সহযোগিতার দরকার হবে?

সূর্যা রাজাকার একটু ভাবগম্ভীর হয়ে বলল, মাস্টারের পোলা ছাত্তার মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিছে। তারে ধরতে অইব। মাস্টারকেও খতম করতে অইব।

মতি রাজাকার একটু সাহস দেখিয়ে বলল, 'তাহলে আর দেরি কেন? এখনোই চলো। রাতের শিকার তো ভালো।

ঠিকই কইছ মতি। তবে মেজর সাহেবের সাথে কথাটি কইতে অইব। পাকবাহিনীর আট-দশ জন সোলজারও নিতে অইব। তারা দূরে থাকবো। বাইরে থেকে তারা পাহারা দিবো। আমরা জব্বার মাস্টারের বাড়ির ভেতরে ঢুকে যা করার করব।

রাত যখন প্রায় নটা তখন সূর্যা রাজাকার জব্বার মাস্টারের বাড়ির বাঁশের গেইট পেরিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলল, দরজা খুলেন ?

জব্বার মাস্টার একটু আতঙ্ক সুরে বলল, কে তুমি ? রাতের বেলায় কী চাও?

আমি সূর্যা রাজাকার। আপনার সাথে কথা বলতে আসছি।

তোমার সাথে আমার কোনো কথা নাই। তুমি চলে যাও?

যাইতে আসি নাই, আপনারে নিতে আসছি। দরজা খুলবেন কিনা বলুন? নয়তো রাইফেল দিয়া বাড়ি দিয়া দরজা ভাংগাইয়া ঘরে ঢুকব।

না, আমি দরজা খুলুম না?

জব্বার মাস্টার এই কথা বলার সাথে সাথে সূর্যা রাজাকার, মতি রাজাকার আরও কজন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে গেল বীরদর্পে।

সূর্যা রাজাকার খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে জব্বার মাস্টারকে বলল, পোলা ছাত্তার কই?

জানি না।

মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিছে?

জানি না।

সূর্যা রাজাকার আরো ক্ষিপ্ত হয়ে রোষাগ্নি চোখে জব্বার মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, তোর পোলা মুক্তিবাহিনীতে

গেছে কিনা, কিছুই যখন জানোস না, তবে বেনটের ঘাই ল। এই বলে সূর্যা রাজকার তিনটে বেনটের ঘাই বসিয়ে দিল জব্বার মাস্টারের বুকের মধ্যে। জব্বার মাস্টার ঘাই খেয়ে মাগো বাপগো বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। খানিক সময় বেনটের ঘাইয়ে জব্বার মাস্টারের বুকের ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে জব্বার মাস্টার কাতরাতে কাতরাতে ভাঙা গলায় ক্ষীণ সুরে শুধু বলতে লাগল, এদেশ একদিন স্বাধীন হবে। তখন তোদের রেহাই নেই। আমার পোলা মুক্তিযোদ্ধা। এর প্রতিশোধ নেবে ছাত্তার।

এই বলে জব্বার মাস্টার কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল রক্ত গড়ানো মেঝেতে।

জব্বার মাস্টারের নৃশংস মৃত্যুর সংবাদ রাতারাতিই চলে যায় রফিক খন্দকারের কানে। সূর্যা রাজাকারও এমন নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে শত্রুমুক্ত হলো মনে করল নিজেকে। তবে জব্বার মাস্টারের ছেলে ছাত্তারের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় সূর্যা রাজাকারের ঘুম হারাম হয়ে যায় দুশ্চিন্তায়। সে মনে মনে ভাবে, ছাত্তারকে খতম করতে পারলে বিপদমুক্ত হব। এমনটা মনে করে সূর্যা রাজাকার কীভাবে ছাত্তারকে ধরা যায় এ নিয়ে শলাপরামর্শ করতে রফিক খন্দকারের বাড়িতে চলে আসে ক'জন অস্ত্রধারী রাজাকার নিয়ে। রফিক খন্দকার তাদের দেখে মনে মনে ভাবল, জব্বার মাস্টারকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দিয়েছে সূর্যা রাজাকার। জব্বার মাস্টারের ছেলে ছাত্তারকেও খতম করতে পারবে সূর্যা রাজাকার। সেজন্য দরকার ফন্দি ফিকির। এমনটা ভেবে রফিক খন্দকার একটু এগিয়ে সূর্যা রাজাকারের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলে, দেওয়ালের কান আছে। এখানে কিছুই বলা যাবে না। এখন তুমি চলে যাও। যা বলার তোমার ক্যাম্পে গিয়েই বলব।

সূর্যা রাজাকার সঙ্গী-সাথিদের ডেকে নিয়ে পুটিয়া বাজারের দিকে চলে আসে বীর ভাব ধরে।

রফিক খন্দকার খানিক সূর্যা রাজাকারের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভাবল, এ এলাকা আমার। যারা আমার সাথে শত্রুতা করবে তাদের রক্ষা নাই। আমি যা বলব তাই এলাকার মানুষকে মেনে নিতে হবে। আমার ওপর যে মাতব্বরি করবে তারই দশা হবে জব্বার মাস্টারের মতো। আমার কোনো দল নাই, যে দলের শক্তি বেশি সেটাই আমার দল। মোট কথা, এলাকা শাসন করতে এবং আমার মাতব্বরি ঠিক রাখতে যে দল করা দরকার সে দলেরই মানুষ আমি।

এমনটা ভেবে রফিক খন্দকার রওনা হলো পুটিয়া বাজারের দিকে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তার পরনে একটি মার্কিন সাদা কাপড়ের পায়জামা গায়ে খদ্দর কাপড়ের পাঞ্জাবি । বাঁ কাঁধে ভাঁজ করা একটি চাদর জড়ানো। পায়ে চপ্পল।

আলো-আঁধারিতে পাকবাহিনীর এক সৈনিক বিস্ফোরিত চোখে উত্তর দিকে মেঠোপথ ধরে এক প্রৌঢ় লোককে খানিকটা দ্রুত পায়েই হেঁটে এদিকে আসতে দেখে বেশ একটু পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। লোকটি যখন বেশ কাছাকাছি এসে গেল ওই সৈনিক তার সঙ্গীসহ লোকটির কাছে এসে বলল, ঠেহরো ?

রফিক খন্দকার কোনো কথা বলল না। রাজাকার ক্যাম্পের দিকে যেতে লাগল।

পাক সৈনিক আবারও রাইফেল উঁচিয়ে বলল, ঠেহরো ?

এবারও রফিক খন্দকার কোনো কথা বলল না।

পাক সৈনিক লোকটির কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে রফিক খন্দকারের ঘাড়ে চেপে ধরে সামনের দিকে বল প্রয়োগ করে বলল, তুম বহুতহারা লোক হে । তুম মুক্তিহো।

রফিক খন্দকার কিছুই বুঝতে না পেরে সাহসের সাথে বলল, আমি বাঙালি।

ঠিক কাহা তুম মুক্তি, তুম বাঙালি।

এ কথা বলে পাক সৈনিক রফিক খন্দকারের বুকের মধ্যে রাইফেলের নলের অগ্রাংশ লাগিয়ে গুলি মেরে দিল বীরত্ব দেখিয়ে।

রফিক খন্দকার গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে করতে বলতে লাগল। জব্বার মাস্টারকে হত্যা করায়ে আমি ভুল করেছি ভুল করেছি...। অতপর রফিক খন্দকারের দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হতে হতে এখানেই সে ইহধাম ত্যাগ করল।

পাক সৈনিক লোকটির মৃত্যু হয়েছে নিশ্চিত হয়ে লোকটির হাতে ধরে হ্যাঁচড়ায়ে হ্যাঁচড়ায়ে পুলের গোড়ার কাছে নিয়ে লাথি মেরে খালের পানিতে ফেলে দিল জিদ দেখিয়ে।

সূর্যা রাজাকার অবশ্য রাইফেলের গুলির শব্দ শুনে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে আসছিল এবং রফিক খন্দকারকে মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাতেও দেখেছিল। কিন্তু এদিকে এগিয়ে আসার সাহস পায়নি সে। পরদিন সকাল বেলা সূর্যা রাজাকার রফিক খন্দকারের মৃত দেহটি পুলের গোড়া থেকে তুলে নিয়ে খাটিয়ায় উঠিয়ে নিয়ে আসে সৈয়দনগরে।

লেখক : সাহিত্যিক ও প্রকাশক

ধারাবাহিক উপন্যাস-৭

ভ্রষ্ট বিলাস

সাগরিকা নাসরিন

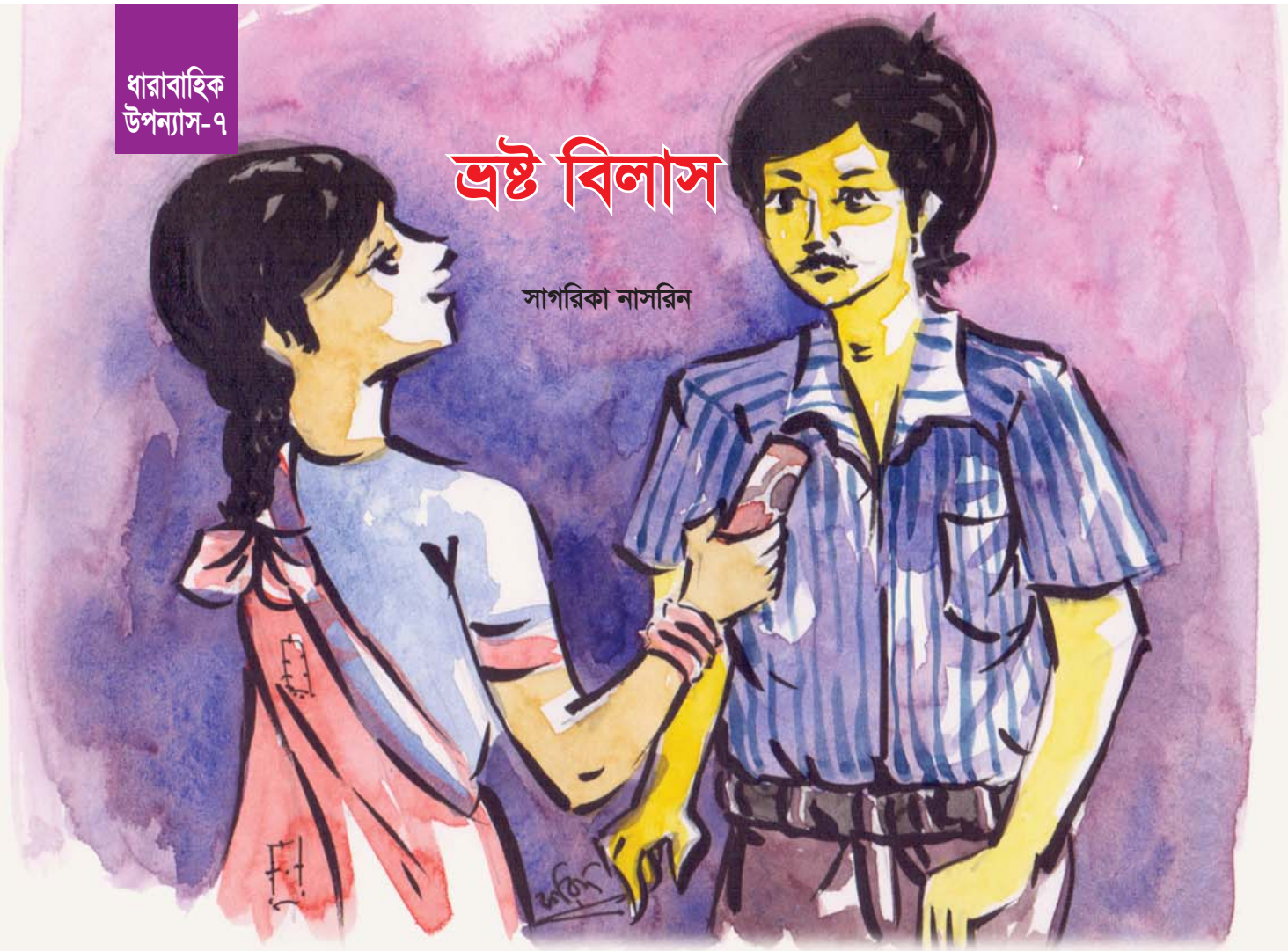

–আপনে এইবার একটু থামেন। ডাক্তার আসতেছেন।

ডাক্তার কী করে খবর পেয়েছে, কে জানে। এসেই কড়া করে ধমক লাগালেন, আপনি এত কথা বলেন কেন। হার্টের রোগী এত কথা বলে!

ডাক্তারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়া। ডাক্তার কেন শেকাবুর সাহেবকে আরো কিছু কড়া কথা শোনাচ্ছে না, সেজন্য সে ব্যাকুল হয়ে আছে। বরং উলটো পথে সে হাঁটছে। পছন্দ হচ্ছে না খেয়ার। লাল্টু টাইপের ডাক্তার। ধমক দিলেও মনে হয় শিষ্ট বয়ান। এরপর একটা আজরাইল মার্কা ডাক্তার খুঁজে বের করতে হবে, যে শেকাবুর সাহেবকে একদম জাদুঘরের মূর্তি বানিয়ে ফেলবে।

রোগীকে বাদ দিয়ে মালা আর খেয়ার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলল, আপনারা মেয়েরা কী করছেন। বাবাকে শান্ত রাখতে পারছেন না। রোগীর ভালো চাইলে শান্ত রাখতে হবে তাকে।

খেয়া জবাব দিতে গিয়েও দিল না। শেকাবুর সাহেব বললেন, ঠিক আছে। আমি আর কথা বলব না।

–রাতে কে থাকবে ওনার কাছে?

ডাক্তারের প্রশ্নে মালা জবাব না দিয়ে পারল না। আমি থাকলে কোনো সমস্যা?

–কেন? সমস্যার কথা বলছেন কেন?

–না মানে পুরুষ মানুষের থাকা দরকার কি-না।

–না, ঠিক আছে। আপনি থাকতে চাইলে থাকুন। একজন থাকলেই হলো। না থাকলেও চলবে না, তা না।

কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখল ডাক্তার। তারপর সোজা মালার দিকে তাকাল। চারদিকের এত ফ্যাশন আর দূরন্ত মেয়েদের মাঝে মাথায় লম্বা ঘোমটা দেওয়া মেয়েটি অন্যরকম, যেন ভোরের স্নিগ্ধ শিশিরের মতো কোমল। চোখ ফেরাতে সময় লাগল তার। চোখে চোখ পরে গেল। কী ভাবছে মেয়েটি কে জানে! হ্যাংলা ডাক্তার! চোখ যদি কারো এত মায়াবী হয়, তো ডাক্তারের দোষ কোথায়?

খেয়া কিছু বলতে যাওয়ার আগেই রাশেদ এল। তার হাতে ব্যাগ ভর্তি ওষুধ-সরঞ্জাম। একটা মোবাইল সেট। খেয়া তাকিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো, চার্জে দেওয়া সেই মোবাইলটা।

মালা আর খেয়া ডাক্তারের সাথে কথা বলার আর সুযোগই পেল না। যা বলার সব শেকাবুর সাহেব বললেন। রাশেদ জিজ্ঞেস করল, আপনার মোবাইল নম্বরটা পেতে পারি?

– শিওর। আমার কার্ডটা রাখুন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে চার্জে দেওয়া মোবাইলটা মালার হাতে দিয়ে রাশেদ বলল, এটা আপনার জন্য। যেহেতু আপনাকে হসপিটালে থাকতে হবে।

মানুষ পরাজিত হয় প্রথম নিজের কাছে। খেয়া লজ্জিত হলো। তার ধারণা ছিল, মোবাইলটা লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যবহার করে রাশেদ। গোপন সম্পর্ক করতে গোপন মোবাইল লাগে।

প্রথমে নম্বরটা সেভ করল রাশেদ। ডাক্তার মুশফিক।

মালা বলল, শুরুটা ডাক্তার দিয়া। সারাবছরতো তাইলে ডাক্তারই খোঁজা লাগবে।

খেয়া বলল, ডাক্তারের নামটাতো সুন্দর। কথাবার্তাও তো খুব ভালো।

ডাক্তারের প্রশংসা পছন্দ হলো না রাশেদের। খেয়া আবার বলল, নামের সাথে চেহারা-আচরণের কী মিল! দেখলেই মনে হয়, ভালো মানুষ।

রাশেদ মালাকে বলল, আপনি প্রয়োজন হলে ডাক্তারকে ফোন দিবেন। কখন প্রয়োজন হয় তা তো বলা যায় না। প্রয়োজন ছাড়া ফোন দেওয়ার

দরকার নাই। খামোখা মানুষেরে বিরক্ত করার কী দরকার।

খেয়া খুব ভালো করে জানে, ডাক্তারের প্রশংসা পছন্দ করেনি রাশেদ। তাই অন্য দিকে কথা ঘুরিয়ে দেয়। স্মার্ট সেজেছে রাশেদ। অথচ তার বান্ধবী থাকার বিষয়টি কী করে মেনে নেয় খেয়া। একটিবার সে চিন্তার ধার পাশ দিয়েও হাঁটে না সে।

দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে ডাক্তারকে ধরে ফেলেছে রাশেদ। লম্বা পা ফেলে হাঁটে ডাক্তার মুশফিক। তাকে ধরা একটু কঠিন আছে। চিকন শরীরের উঁচু-লম্বা মানুষটি ট্রেনের মতো ছন্দে চলে। প্রাণবন্ত হাসিখুশি মানুষ। দূরত্ব কাটিয়ে এদেরকে ধরে ফেলতে পারলে, এদের কাছে যাওয়া খুব সহজ। মানুষ নিয়ে গবেষণা আছে রাশেদের। ডাক্তার মুশফিক যে উপকারী ভালো মানুষ, সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

মুশফিকের সাথে খাতির জমিয়ে ফেলল রাশেদ। সারাবছর মানুষ ডাক্তারদেরকে গালি দেয়। ভালো ডাক্তারকেও দেয়। স্বাধীন দেশে মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসা চায়। পয়সা দিয়ে সে ওষুধ কিনবে। প্রেসক্রিপশনের মতো একখানা কাগজ পয়সা দিয়ে কিনতে হবে কেন!

কেবিনে ফেরার পথে ক্যান্টিন থেকে রাতের খাবার কিনল রাশেদ। মালার যাতে কোনো কিছুর অভাব না হয়, চেষ্টার কমতি করল না সে। চায়ের ছোট্ট ফ্লাস্ক পর্যন্ত কিনে ফেলল। এত কিছু কেনার পরেও তার মন কী যেন কেনা হয়নি বলে খোঁচাচ্ছিল তাকে। লম্বা লাইন ধরে লিফটে ওঠার পরে তার মনে হলো, মালা তাকে একটা ফল কাটার চাকু কিনে আনতে বলেছিল।

মেজাজ বিগড়ে না গিয়ে উপায় আছে? কেন সময়মতো প্রয়োজনের কথা মনে পড়ে না। লিফট সাঁই সাঁই করে উঠে চলেছে পাঁচ তলার অভিমুখে। সুন্দরী এক ভদ্র মহিলার দিকে এক আহাম্মক পুরুষ বেচারা হা করে তাকিয়ে আছে। এদের মতো শরমহীন পুরুষদের জন্য মেয়েরা গড়ে গোটা পুরুষ জাতির বদনাম করার সুযোগ পায়। মুখের হা গলে একটা মাছি যদি কোনো রকমে ঢুকে যেত ওর গলা দিয়ে, শান্তি পেত রাশেদ। মানুষ এত বেহায়া বেশরম হয় কী করে!

কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পরেছেন শেকাবুর সাহেব। সাজিদ আগেই বাসায় চলে গেছে। খেয়াকে নিয়েই হাসপাতাল ছাড়তে হলো রাশেদকে। দুজনার কথা বন্ধ। ওদের নীরব ভাষার আদান-প্রদান, মান-অভিমান, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সব মিলিয়ে আলাদা এক সম্পর্কের টানাপোড়েন মালাকে না ভাবিয়ে পারে না। কেবিন লাগোয়া ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখল মালা। দূরত্বের আবডালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চোখে পলক ফেলল না।

বাসায় ফেরার আগে ডাক্তার মুশফিক আবার এল। শেকাবুর সাহেব ঘুমুচ্ছিলেন। মালারও চোখ ভেঙে আসছিল ঘুমে। গলায় স্টেটসকোপ ঝুলানো ছাড়া মুশফিককে চিনতে না পেরে মালা বলল, আপনি!

–আমি ডাক্তার মুশফিক।

–মাফ করবেন। চিনতে পারিনি।

–ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই তো?

–না, আমাদের আবার কী সমস্যা? তবে সরকারি হাসপাতালে অনেকবার গেছি। মশার কামড় খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু এত বড়ো হাসপাতালেও যে মশা আছে, একটু অবাক লাগতেছে। বেশি না। দুই-চারটা।

–তাই নাকি। মশাতো থাকার কথা না।

গরিবের মেয়ে। ধনীর স্ত্রী। মালা খুব সাহস করে বলল, মশার কথা বলছি, কিছু মনে করেননি তো?

–না.. না কী মনে করব? আমি স্প্রে করতে বলে দিচ্ছি। আর যাতে কোনো মশা আপনাকে দেখতে না হয়।

–আমি আমার কথা ভাবতেছি না। রোগীর কথা ভাবতেছি।

–এত ভাবার কোনো কারণ নেই। ভাবনা সব আমাদের উপরে ছেড়ে দিন।

ডাক্তাররাও এমন সুন্দর করে কথা বলে! মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের দুর্ব্যবহারে অভ্যস্ত মালার কাছে বিস্ময় মনে হয়।

ডাক্তার মুশফিক বলল, রাশেদ সাহেব আপনার মোবাইলে আমার নম্বর সেভ করে দিয়েছে। তাইতো? তো এখন আপনি আমাকে একটা রিং দিন। আমি আপনার নাম সেভ করে রাখি। রাতে কোনো সমস্যা হলে জানাবেন। আননোন নম্বর হলে ব্যস্ত থাকলে অনেক সময় রিসিভ করতে পারি না। নাম জানা থাকলে রিসিভ করতে না পারলেও ব্যাক করব। আপনি একটা মিস কল দিন তো আমাকে।

–আমি কল দেব? এই মোবাইলতো আমি কখনো চালাইনি। রাশেদ আজকেই কিনে দিয়েছে। দামি মোবাইল তো...। নম্বর কীভাবে বাইর করতে হয়..।

–ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা না থাকলে আমাকে দিন।

–কিসের অসুবিধা?

–আপনার পারসোনাল মোবাইল তো।

মালার মোবাইল থেকে নিজেরটাতে রিং করল মুশফিক। তারপর বলল, কী নামে সেভ করব?

–নাম সেভ করার দরকার নাই।

–কেন? আপনার কি কোনো নাম নেই?

–নাম থাকবে না কেন?

–তাহলে বলুন।

মালা শান্ত গলায় বলল, আমার নাম মালা।

অবাক চোখে মালার দিকে তাকাল মুশফিক। তারপর বলল, আমার সিনিয়র ম্যাডামের নাম ডাক্তার মালা খান। আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। দেখতেও অনেকটা আপনার মতো। খুব সুন্দর।

সুন্দর কথাটা বরাবর শোনে মালা। নতুন কোনো আকর্ষণ নেই ওটাতে। কিন্তু ডাক্তার মুশফিকের কণ্ঠে শব্দটা কি একটু অন্য রকম শোনাল! অন্য রকম আবহ বয়ে নিয়ে এল! কানে বাজল মনে হলো। মনের মধ্যে ভাবনাটা ঘুরছে। অপ্রস্তুত হলো মালা।

মুশফিক যখন বিদায় নিল, মালার ঘুম তখন পরবাস। কেবিন লাগোয়া বারান্দার দিকে তাকাল। বারান্দা তার খুব প্রিয় জায়গা। সাদা ওয়ালের বারান্দাটায় কারুকাজ করা গ্রিলগুলোতে এত চমৎকার সাদা রঙের প্রলেপ। স্বপ্নিল সাদা। হাসপাতালের চারদিকে সোডিয়াম নিয়ন বাতি জ্বলছে। জোছনার মতো। গ্রিলে মাথা ঠেকাল মালা। তার বেডরুম ঘেঁষা বারান্দাটার কথা মনে পড়ছে। বাসায় না ফেরা পর্যন্ত অবহেলায় পরে থাকবে বারান্দাটা। একটু ঝাড়ুর ছোঁয়া পরবে কি-না, রুনীর মার অনুগ্রহ হবে কি-না কে জানে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে শিক্ষা নিতে রুনীর মাকে আরো কয়েকবার জন্ম নিতে হবে। ওকে নিয়ে পারা যায় না। এক বেলার খাবার পরে, টেবিল মুছতে মুছতে আরেক বেলার খাবারের সময় চলে আসে।

ঘুম একবার চলে গেলে ফেরত পাওয়া মুশকিল। হাজারো চিন্তা ভর করে মাথায়। সাজিদ খুব মন মরা ছিল সারাদিন। শেকাবুর সাহেবের জন্য ভেতরে ভেতরে ওর মমতার যেন শেষ নেই। অথচ কতটুকু ওর জন্য আছে শেকাবুর সাহেবের? একটুও নেই। সাজিদের জন্য কিছুই করবেন না কোনোদিন। পেটে–ভাতে খাটিয়ে মারা ছাড়া তার কোনো দায় নেই। সব জানা আছে মালার।

সকালে বাসার সামনে থেকে তাজা দেখে শিং মাছ কেনা হয়েছিল। ফরমালিন ফ্রি বলে তিন কেজি একসাথে। কী বিপুল বিক্রমে মাছগুলো লাফাচ্ছিল। তাই দেখে সাথে সাথে মাছগুলো ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রুনীর মা। না মরলে নাকি ওগুলো কুটতে দারুণ ঝক্কি। এতক্ষণে হয়ত একে একে প্রাণ চাঞ্চল্যতা হারিয়েছে মাছগুলো। কতগুলো তাজা প্রাণ! মাছগুলোর জন্য হঠাৎ খারাপ লাগতে শুরু করেছে মালার।

নির্জন বারান্দায় এরকম শিরোনামহীন কষ্ট পাওয়ার কোনো মানে হয়!

চলবে...

মুক্তিযুদ্ধের কবিতা

সোহরাব পাশা

দরজা খোলে না কোনো বাড়ি

ফুলের বদলে বাতাসের ঠোঁটে ঝরে বারুদের
ঘ্রাণ
কান্না ভুলে যায় চোখ
প্রিয় চোখ খোঁজে কোথাও নিবিড় আড়াল
সন্ধ্যে রাতেই নিঝুম বধ্যভূমি যেন পাড়াগাঁও
এই সময় কী এক ভয়ে তড়িঘড়ি বিয়ে হলো
হাওয়া বুবুর, খুব শব্দ শূন্য বিয়ে,

কেন যেন নাইয়র হলো না বুবুর...
এক মেঘলা দুপুর ঘুমিয়ে পড়ল হাওয়া বুবুর চোখে
হঠাৎ মৃত্যুর মতো তীব্র আর্তনাদ, আঙিনার
নিমগাছ ফুটো করে হায়েনার সুতীক্ষ্ণ বুলেট
ঢুকে গেল হাওয়াবু'র বুকে,

সেই নীল ক্ষত নিয়ে হাওয়া'বু আজ
মুক্তিযুদ্ধের নতুন কবিতা পড়ছে
অশ্রুভেজা চোখে।

যুদ্ধ করে

আলম তালুকদার

আমার দেশে সবুজ গাছে কোকিল যখন ডাকে
পাকবাহিনী গুলি করে মারছে তখন তাকে।
আমার দেশে সবুজ মাঠে বাতাস যখন খেলে
পাকবাহিনী নাপাক হয়ে পোড়ায় আগুন জ্বেলে।

আমার দেশের প্রজাপতি উড়ছে যখন ডালে
ভয় দেখিয়ে মারছে তাদের নাচের তালে তালে
আমার দেশের মায়ের কোলে শিশু যখন হাসে
পাকবাহিনী দাঁতাল অসুর একাত্তরে আসে।

কোকিল মারে সবুজ মারে মানুষ মারে এক নাগাড়ে
বানায় মাটি তামা
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে খুব সাহসে যুদ্ধ করে
বাবা-চাচা-মামা।
যুদ্ধ করে সূর্য আনে আলো ছড়ায় প্রাণে প্রাণে।

স্বাধীনতার পতাকাটা

গোলাম নবী পান্না

স্বাধীনতার আলোয় জাগা প্রাণের বাংলাদেশ
এমন পাওয়া জাতির ভাগ্যে হয় না কোনো শেষ।
ভাগ্য পুষে বসে থাকা নয়তো বীরের সাজ
লড়াই করে বেঁচে থাকা গর্ব করার কাজ।
বাংলাদেশের মানুষগুলো লড়াই করে শেষে
স্বাধীনতার পতাকাটা ওড়ায় সোনার দেশে।
এই পতাকায় স্বপ্ন গড়ার প্রেরণা পায় জাতি
স্বাধীনতা নিয়ে বুকে সুখের মাতামাতি।
আঁধার ভুলে আজকে জাতি আলোর কথা বলে
দীপ্ত শপথ আঁকড়ে বুকে স্বাধীনভাবে চলে।
স্বাধীন চলা এবং বলা স্বপ্ন যখন ভাসে
যুদ্ধ সে-পথ রচনাতে স্বাধীনতা আসে।

ভালোবাসার মানবজমিন

শাফিকুর রাহী

স্বাধীনতার মানে খুঁজতে গিয়েছিলাম সোহাগপুরের বেনুপাড়ায়
একাত্তরের পঁচিশ জুলাই গভীর রাতের গণহত্যার নির্মম ক্ষতচিহ্ন
আজও বিধবাপল্লির মায়েদের চোখের অশ্রুতে ভাসমান আর
বেদনার বিলাপ গুমড়ে ওঠে হাড্ডিসার দেহের ভাঁজে;
অপুষ্টির যন্ত্রণায় কাতরায়' পরানপাখিও বুঝি যায় যায়,
স্বাধীনতা কেমন জিনিস বীরাঙ্গনা লাকজান বেওয়া আজও জানে না।
নিঠুর আদিম বর্বরতার ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞের হিংস্র থাবা আজও সে ভোলেনি
সে অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়নের ভাষা কী কখনো বর্ণনা করা যায়?
পাকসেনাদের মানবিকতা বিবর্জিত রণ হুংকারে কাঁপে আসমান–জমিন।

মৃত্যুউপত্যকা প্রাণের স্বদেশে লাশের মিছিল ক্রমাগত দীর্ঘ হতে থাকে;
যে অজ-আঙিনায় পুরুষশূন্য গেরামে নারীদের আর্ত হাহাকারে
বৃক্ষের দীর্ঘশ্বাসে পাখিরা গান ভুলে যায়, শস্যভরা শ্যামল ভূমিতে
দেশীয় শকুন-হন্তারকের দানবীয় দাপটে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়
সাধের ঘরসংসার; পাক-দখলদারের দোসররা লুণ্ঠন করে
বেবাক ধনসম্পদ; অগ্নিতে নিক্ষেপ করে জীবন্ত শিশু ও নারীকে
গ্রামের পরে গ্রাম জ্বেলে দেয় বসতভিটে বিরান।

সে বীভৎস গণহত্যার পাক-মার্কিনীয় এদেশীয় দালালরা
স্বাধীনতার দীর্ঘজনম পরও বহাল তবিয়তে দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডে
হুংকার ছাড়ে অপবাদ অপযুদ্ধের; সেই গুপ্তঘাতকদের জঘন্য সন্ত্রাসে
স্তম্ভিত বাকরুদ্ধ এক নগর বাউল গায় ভালোবাসার মরমীয় সংগীত।
আজও আত্মার আয়নায় ভেসে ওঠে পরম ভালোবাসার রক্তাক্ত মানবজমিন
কত না আত্মত্যাগের নির্মম কষ্টগাথা শোকাশ্রুতে ভাসমান;
এক কবরে শত লাশের কাফনবিহীন দাফন করার নিদারুণ নিদানের
দুঃসহ কালবেলা আজও ভাবায় ভীষণ!

যারা হাতে লাঙল আর কাঁধে স্টেনগান, থ্রিনট থ্রি রাইফেল নিয়ে
জীবন-মরণ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল স্বাধীনতার দারুণ আকাঙ্ক্ষায়
আজও তাদের ভাগ্যের অদলবদল হয়নি, মানবেতর কাল কাটে
পুষ্টিহীনতার নিদারুণ দাহে জ্বলে পরম মানবিক ভূগোল;
মাটির ডেরায় নৃত্য করে রাতের জোনাক, দোয়েল-চড়ুই'র সুখের আবাস
শনের খোপে কিচিরমিচির প্রেমালাপে পথহারা এক পথের কবি
ধ্যানমগ্ন তপস্যাতে যায় কেটে সারাবেলা।
সর্বকর্মের দুর্বৃত্তায়ন দুর্নীতি বৈষম্য দূর করতে হলে জাগতে হবে জায়গা সবে
ন্যায়-নীতির মশাল হাতে একাত্তরের যোদ্ধা হব বীরের বেশে জয়োল্লাসে
গাইব সবাই— আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

স্বাধীনতা তুমি এসেছ বলে

লিলি হক

এত কষ্টের এত রক্তের
এতগুলো প্রাণের বিনিময়ে
পাওয়া হে স্বাধীনতা!
তুমি এসেছ বলেই
আমরা পেয়েছি নতুন দিনের সজীবতা।

রক্ত গোলাপের পাপড়িতে ঘ্রাণ নেই তোমার
তোমাকে পাওয়ার তৃষ্ণায় তৃষিত আত্মার
শুনেছিলাম বজ্র শপথে বিপ্লবী চিৎকার
ধ্বনিত হয়েছিল আকাশ বাতাস বাংলার
লাশে লাশে রক্তাক্ত হয়েছিল
সুপেয় নদীর টলমল জল।

হে স্বাধীনতা তোমাকে হারাতে চাই না,
হে আমার প্রিয় স্বাধীনতা
এত সাধনায় অর্জিত এই স্বাধীন দেশে
কেন ঘটে সন্ত্রাস ছিনতাই রাহাজানি
ভাইয়ে ভাইয়ে কোন্দল হানাহানি।
আমরাতো চাই স্বাধীনতার সুফল পেতে,
আমরাতো চাই স্বাধীনতা-প্রাপ্তি সুখে বিভোর হতে।

বিজয়ী জাতির হে বিজয়ী পিতা

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

তুমি আসবে বলে
সেদিন ৭ মার্চের মতোই আবার জনগণ এল দলে দলে।
ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
হৃদয়ের টানে
সারা জাতি যেন পড়েছিল উপচিয়ে
বঙ্গবন্ধু তোমাকে এক পলক দেখার আগ্রহ নিয়ে!
সেদিন এসেছিল, তোমাকে দেখে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করার জন্য
হতে ধন্য
সর্বস্তরের মানুষ (অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ,শিল্পী, সাংবাদিক, কবি ও গায়ক)
আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের হে মহানায়ক!
তোমার অবর্তমানে
বিজয়ের স্বাদ নিয়ে বিজয় দিবস পালিত হয়নি দেশের কোনোখানে।
বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান 'স্বাধীনতা'
সত্যিকার অর্থেই পায়নি তখনো পূর্ণতা।
তুমি আসবে বলে
সেদিন সকাল থেকেই প্রতীক্ষিত মানুষেরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এল চলে।
পাকিস্তানি কারাগার মুক্তহয়ে নির্ভয়ে
তোমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিশেষ মুহূর্তটিকে হৃদয়ে করতে ধারণ
সবাই গভীর আগ্রহে গুণছিল প্রতিটি ক্ষণ।

বিজয়ী জাতির হে বিজয়ী পিতা!
ঘোষিত হবার সাথে সাথেই তোমার আগমনি বার্তা
জেগে উঠল জনতার বান!
জাতি যেন ফিরে পেল প্রাণ!

ওগো জাতির পিতা
রাজনীতির কবি হয়েও তুমি সেদিন শোনাওনি কোনো কবিতা।

সেদিন তোমার দরদি কণ্ঠটি ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত
ত্রিশ লাখ শহিদের প্রতি জানিয়েছিলে গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য
জানিয়েছিলে– গভীর কৃতজ্ঞতা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিবনগর সরকারের প্রতি
যারা তোমার নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ছিল ব্রতী।
পাক হানাদারবাহিনী ও এদেশের তাদের দোসরদের দ্বারা
বীরাঙ্গনা যারা
দুই লক্ষ বোন ও মা
তাদের প্রতি সেদিন জানিয়েছিলে– গভীর সমবেদনা।
আহ্বান জানিয়েছিলে পৃথিবীর মুক্ত দেশগুলোর প্রতি
স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে দ্রুত দিতে স্বীকৃতি
বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক এদেশের নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে গণহত্যার
আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের মাধ্যমে জাতিসংঘের কাছে চেয়েছিলে বিচার।

আনন্দে সেদিন নেচে উঠেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
যখন তুমি শুনিয়েছিলে পিতা দেশ ও জাতি গঠনের গান।

সেই ঋণ

কনক চৌধুরী

সেই ঋণ চিরঋণ চিরদিন
জন্ম থেকে আজন্ম ঋণ
সেই ঋণ চিরদিন চিরঋণ
জন্ম থেকে জন্মান্তর ঋণ

জন্মেও তুমি মহাকালে মহান
মরণেও তুমি কালজয়ী চির দীপ্তিমান
বাংলার মহানায়ক অমর স্মৃতিতে অম্লান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এখানেই জন্ম তোমার

কালী রঞ্জন বর্মণ

তোমার জন্ম তর্জনীর অমিত স্পর্শে
উন্মথিত সমুদ্রের জেগে ওঠা ঢেউ;
তোমার জন্ম প্রতিবাদে উত্তোলিত হাত
মিছিলের অগ্রভাগে আলোকিত দুর্জয় মিছিল।

তোমার জন্ম স্কুলের পথ ভুলে রাজপথ
মিছিলে বুলেটবিদ্ধ শহিদ বালক শঙ্কু সমাদ্দার
তোমার জন্ম প্রেমিক যুবার আনমনা উদ্বেগ
বুকে সৃষ্টির উন্মাদনা রক্তকণায় অস্থির আবেগ।

প্রতীক্ষায় টান টান চেতনায় স্নাত কসাই শাহেদ আলীর
শক্তপেশী, নিশপিশ হাতের আঙুল অস্থির আক্রোশে
দিন দিন শান দেওয়া সূর্যের মতো আলোকিত ছুরি
শত্রুসেনার শক্ত গর্দান টপ্ টপ্ রক্তে ভেজা...

তোমার জন্ম সর্বনাশের আগুন বুকে রংপুর সেনানিবাস
ঘেরাও অভিযান; যুদ্ধের অজানা কৌশল নির্ভয়
ক্ষেত থেকে ছুটে আসার ক্ষেতমজুর সুশীল বর্মণ
শনশন্ শক্ত লাঠির জাদু খেলায় যুদ্ধ প্রয়াস
দুর্মর তারুণ্য...

তোমার জন্ম চোখের জলে না নেভা আগুন
সর্বস্বান্ত সুন্দরী বেওয়ার শূন্য বসতভিটা, হাহাকার
শত্রুশিবিরে বনেদি অতুল বৈরাগী জন্মভেদ পরিচয়ে
কর্তিত শিশ্নদেশ

কিশোর মুক্তিযোদ্ধার আমৃত্যু স্বাধীনতা, থ্রি-নট-থ্রি
অব্যর্থ নিশানা...

জন্ম তোমার ঘাঘটের কোল অচেনা বধ্যভূমি, অসংখ্য
লাহিড়ীহাট, শংকামারী, বুড়িগঙ্গা, রায়েরবাজার।

পঁচিশের পেট চিরে আলোর হলকা ছোটে রাতের আকাশে
জননীর কোল থেকে ছিটকে পড়া অসহায় শিশুর ক্রন্দন
রক্তে কার্তুজে প্রভাত আলোর কম্পন...
এখানেই জন্ম তোমার এই অবিনাশী আলোর ভুবনে।

এদেশ আমার

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

এদেশ আমার একাত্তরে
যুদ্ধ করা
রক্তে সাঁতার কেটে কেটে
এদেশ গড়া।

ঘর পুঁড়েছে হাজার হাজার
জান দিয়েছে কত,
মুক্তিসেনা হার মানেনি
ছুটল বাঘের মতো।

এদেশ আমার পুত্রহারা
মায়ের চোখের জল
বীরের জাতি বীর বাঙালির
অটুট মনোবল।

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
পেলাম স্বাধীনতা,
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে
বলব মনের কথা।

সেদিন থেকে বিজয় দিবস
আমরা পালন করি
লাল-সবুজের ঐ পতাকা
শক্ত হাতে ধরি।

এবার দেশটি গড়তে হবে

লিটন ঘোষ জয়

তোমার স্বপ্ন ছিল
আমাদেরকে একটি মানচিত্র দেবে, স্বাধীনতা, বিজয় এবং বাংলাদেশ দেবে।
তুমি তা দিয়েছ, দিয়েছ। ধু-ধু মরুর বুকে জলবতী মেঘে,
নিকষ আঁধারে নীল জোনাকি।
তুমি আমাদেরকে দিয়েছ
আমন ধানের সোনাবরণ হাসি, শিশিরে স্নান করা শিউলি,
দোয়েলের মধুমাখা সুর, প্রজাপতির বর্ণিল ডানা,
সরষে ফুলের ক্ষেতে হলুদ পাখির নাচন, ধবল মাটির উঠান।
তুমি দিয়েছ
আমার মায়ের সম্মান, বাবার স্নেহ,
বোনের মমতা, ভাইয়ের শাসন, খুকুর তুলতুলে গাল।
তুমি দিয়েছ
ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের প্রতিদান, লাল-সবুজ পতাকা।
আমরা তোমার সাহসে সাহসী, তোমার গর্বে গর্বিত বাঙালি।

হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, হে স্বাধীনতার রূপকার;
তুমি বলেছিলে–'এবার দেশটি গড়তে হবে'
সেই থেকে আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখা,
সেই থেকে আমাদের নতুন পথ দেখা।
আজ বাঙালির যা কিছু অর্জন– তা তোমার জন্য, তোমার কল্যাণে
আমরা তোমার দেশটাকে গড়ছি—
যে দেশের সোনার বাংলার স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে।
পিতা তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো;
আমরা যেন তোমার দেখানো পথে এগিয়ে যেতে পারি।

শ্রেষ্ঠ তুই

এমদাদ শুভ্র

একাত্তরের রক্তস্নাত
উদয় পথের সূর্য তুই,
চির সবুজ বাংলা মায়ের
বুকের স্বাধীন পরশ তুই,
স্বাধীনতার কেতন তুই,
বীর বাঙালির চেতন তুই,
গভীর আবেগ শ্রদ্ধা, ও রে–
তোর চরণেই পুষ্প থুই'।

তুইতো দেশের মুক্তিকামী
তুইতো শহিদ শ্রেষ্ঠ বীর,
তোর স্মরণেই অশ্রুদানে
বঙ্গবাসী আজ অধীর।

বীরাঙ্গনা-গাজীরে –
সালাম জানাই আজি রে,
বাংলা মায়ের খোঁপার শোভা
তুইতো জবা-গোলাপ-জুঁই।

একটি বজ্রকণ্ঠ

সোহেল বীর

একজন বঙ্গবন্ধু—
একটি বজ্রকণ্ঠ, একটি ভাষণ
একটি স্বপ্ন— স্বাধীন হওয়ার
একজন বঙ্গবন্ধু
মহান নেতা–একটি দেশ,
লাল-সবুজ পতাকার।

তোমার টি-শার্ট হ্যাঙ্গারে ঝুলছে

বাবুল তালুকদার

তোমার টি-শার্ট হ্যাঙ্গারে ঝুলছে
তোমার হাসি আমাদের চোখে চোখে
স্মৃতি হয়ে ভাসছে।
তুমি মহামানবের, আপামর মানুষের
মানবতার কবি, দ্রোহী কবি রফিক আজাদ।
তোমার কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়ায়
আকাশে-বাতাসে। অথচ,
তুমি নেই!
শূন্যতার মাঝে হাহাকার
তুমি চলে গেলে চিরবিদায় নিয়ে ওপারে;
আমরা শোকাহত ক্ষতবিক্ষত
প্রকৃতিও তোমার জন্য অস্থির
হাহাকার চারদিক
তুমি প্রেমিক, মানবতার কবি রফিক আজাদ।
তোমার কবিতার ফসল বেঁচে আছে
বেঁচে থাকবে শতাব্দী থেকে শতাব্দী।
তুমি বাঙালি— কালজয়ী কবি;
বীর মুক্তিযোদ্ধা— রাষ্ট্রের মুকুট।

তোমার চাষ করা কবিতার ফসল
বাঙালি জাতির গোলাঘরে;
গণমানুষের অন্তর গহিনে
ছুঁয়ে যায় বার বার অথচ,
তুমি চিরনিদ্রায়।
কবি, তুমি বাসন্তি বাংলার
মা ও মাটির—সকলের।

চেতনার সেই মণি

বাপ্পি সাহা

যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস আজ বাঙালির জয়
রক্তে রক্তে জয় বাংলাতে নেই পরাজয়-ক্ষয়।
আমি তুমি এক, এক এই বাংলা, নেই বাংলাতে ভয়
সবকিছু আজ এক বৃত্তে মুক্তিতে ঝলমল।
মৃত্তিকা আজ রেখে যায় ঘ্রাণ জুড়িয়ে আমার প্রাণ
চারদিকে আজ শুধু তাই নয়, কিছু ম্রিয়মান।
ইতিহাসে শুধু দেখি আমি আজ মুজিবের কালধ্বনি
আসবে কি ফিরে আর কখনো চেতনার সেই মণি?

প্রমাণ প্রেমের দারুণ আহ্বান

কামাল বারি

পাকা ধানের উজ্জ্বল নগ্নতা ওই কৃষাণ মেয়ের ঐশ্বর্য;
অকপট ভূমির সাথে আমি নিবিড় গেঁথে যাই!
নগর-ব্যস্ততা ছুড়ে ফেলে চলে যাই শস্য সুঠাম
বাংলার প্রান্তরে;
অন্তরে যার অপার আগ্রহ চিরকাল..;
সম্পন্ন ফসলের উদার হাতছানি আমাদের
প্রতি ইঞ্চি ভূগোলব্যাপী;
নিস্পৃহতা ছুঁইতে পারে না কখনো এ মাটির
কঠিন কৃষানের মন;
কৃষানি তার চরায় খরায় বানে বন্যায় বাঁধে বুক;
বার বার বাঁচবার সংগ্রাম প্রকৃত যোদ্ধা নারীর;
প্রমাণ প্রেমের দারুণ আহ্বান নিয়ে জেগে থাকে
সংসার সেবাপরায়ণ মানসী;
অগণন নক্ষত্র দোল খায় এখানে শস্যল ফসলের ক্ষেত
আর নারীর কোলজুড়ে;
প্রজ্ঞাময় প্রজন্ম জন্ম-জন্মান্তরে শুধু মানবিক আলো চায়।

অপূর্ণ ভালোবাসা

আবেদীন বাপ্পী

আজ মঙ্গলবার–
ঠিক সাত বছর আগের কথা,
মল চত্বরে তুমি বলেছিলে–
'আমার আব্বু আমাদের সম্পর্ককে মেনে নেবে না
তুমি আমাকে এখানে আর ডেকো না প্লিজ'
এই বলে তুমি চলে যাচ্ছিলে।
মনে পড়ে রাহেলা,
সেই দিনটির কথা
একবারও চোখে চোখ রাখোনি সেদিন, এমনকি আমার হাতটাও ধরোনি
দেখতে পেয়েছিলাম তোমার বিফল বিপ্লব
অবুঝের মতো বুঝেছিলাম ঠিকই
তবে ভুলিনি।

কত বুধ, কত বৃহস্পতি গেল
শনিও এসেছে জীবনে,
তবু ভুলিনি সেদিনের সে কথা,
প্রতিবাদ করতে পারিনি কারণ
ছিল না বড়ো পরিচয়,
ছিল না টাকা, ছিল না ভালো মাইনে।
ভালোবাসা ছিল প্রবল
রাহেলা, একটা সত্যি কথা বলবে আজ
তুমি কি এখন খুব সুখী?

আমার সব আছে শুধু তুমি ছাড়া,
আমি আজও মল চত্বরে যাই তোমার আশায়
যদি ফিরে আসো!

আজ আসবে কি সেই চত্বরে?
আমি আর সেই ভিখেরি নেই রাহেলা
তোমার বাবা আমাকে নিয়ে গর্ব করবে আজ — আমি নিশ্চিত
এখন আমার অনেক সুনাম, অনেক টাকা, অনেক অনেক।

আমি এখন অনেক বদলে গেছি রাহেলা,
অনেকে বলে এখন –
কিন্তু আমার মনের ভেতরটা তো বদলায়নি
এখনো তোমার জন্য মনটা কাঁদে আমার,
তোমার জন্য অপেক্ষা করি,
আমি যদি বদলাতামই

তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরেও
তোমার কথা মনে করি এখনও?
কী জানি — আমি বোধ হয় এমনি।

জানো রাহেলা, মল চত্বরটা তেমনই আছে,
শুধু বদলেছে কিছু পরিচিত জন,
সাত বছর আগে এখানে যারা তোমার আমার মতো আসত
চুপি চুপি প্রেম করার জন্য —
তাদের অনেকেরই সংসার হয়েছে, ফুটফুটে বাবুও হয়েছে
কী যে ভালো লাগে!
স্বপ্নে আমি তোমায় নিয়ে জীবন গাঁথি,
তবে ভয় হয়, আবার ফিরাবে নাতো?

তুমি কথা দিয়েছিলে আজ আসবে
ঘড়ির কাঁটা তিন থেকে নয় হয়েছে,
সূর্যের আলো হারিয়ে গেছে চাঁদের আলোয়
এমনতো কথা ছিল না রাহেলা,
তোমার শবদেহ দেখব বলে
আমি এখানে আসব।

ক্লান্তির পর

রোকসানা গুলশান

হাতের পাতায় যখন দুচোখ ঢাকা
আলোছায়া নিঃসীম অন্ধকার...
অতল যে মহাশূন্যতা
ডাক দেয় খুব
চলে যাই, চলে যাই...

পৃথিবীটা টেনে ধরে
বিরহী বন্ধুর মতো
আলোকরশ্মি ঢেলে বলে,
এখনো আসেনি সময়!
বীজের সাধনা তোমার, হয়নিতো খাঁটি
পথ সামনের এখনো অনেক বাকি।

আসবে ফসল-দিন
বাজবে ধ্বনি কত না
সুরে ও বাজনার উৎসব যেন
মায়াময়! মোহময়!

মমতা যখন হবে নিঃশেষ
বোঝা হবে ভারী
সইবে না সইবে না
খসে যেয়ো, ছেড়ে দিয়ে হাত
বন্ধু, হারিয়ে যেয়ো না তা
হারিয়ে যাওয়ার আগে।

পুনর্মিলন

নাহিদ মিশকাত

আমি তুমি সময়
সময় পর নিশ্চয়
আমি আপন আমার
তুমি তবে কার?

তুমি সময় কষ্ট
সম্পর্ক পথভ্রষ্ট
সময় আমার নতুন
প্রজাপতি ফাগুন।

কষ্ট তুমি একা
বিরহ পথ কুহেলিকা
জীবন পথ বন্ধুর
সুখ মরীচিকা সুদূর।

আমি সময় ফাগুন
লাল-গোলাপি আগুন
সময় যেন স্বপ্ন
মুগ্ধ জীবন মগ্ন।

তুমি স্মৃতি সময়
পথচলা অবহেলায়
নিঃসঙ্গ গন্তব্য দুর্গম
বেদনা সময় অবিরাম।

সময় তোমার বন্ধু
পেরিয়ে বিষাদ সিন্ধু
সময় সবিনয় বিনোদন
সুখ হর্ষ আলাপন।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, 'আপনারা এখন দেশের উন্নত জনশক্তি। আমি আশা করি, আপনারা অর্জিত জ্ঞান ও মেধা মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করবেন। আপনারা বিবেক দিয়ে কাজ করবেন। আপনারা অবশ্যই দেশ এবং জাতির স্বার্থ রক্ষার্থে অগ্রাধিকার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখবেন'। ১৭ জানুয়ারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় এগিয়ে নিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে সরকার শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিপূরক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কাজ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের পদক পরিয়ে দেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, উচ্চশিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা ও মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

একটি উন্নত দেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় জাতিকে আবারো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ২২ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদের ১৪তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদানকালে রাষ্ট্রপতি একথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, একটি উন্নত দেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকেও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য থেকে জাতির অগ্রযাত্রার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবরূপ দিতে বর্তমান সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সমুন্নত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুজ্জ্বল রাখতে, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করতে, দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে দেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বাঙালি জাতিকে আবারো ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির যে পথে আমরা হাঁটছি, সে পথ ধরেই বাংলাদেশ আরো বহুদূর এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বসভায় একটি উন্নত দেশ হিসেবে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হবে। তিনি আরো বলেন, সংসদ দেশের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও আলোকিত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, একাত্তরের শহিদদের কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ রয়েছে। তিনি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এবং দল-মত-পথের পার্থক্য ভুলে জাতির গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে লাখো শহিদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করার আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বিপথগামীদের সুপথে ফিরিয়ে আনার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিপথে যাওয়া ছেলেমেয়েরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্যদিয়ে সুপথে ফিরে আসবে। বই দিয়ে ছেলেমেয়েদের বিপথে যাওয়া থেকে উদ্ধার করা যায়। তাই তিনি সবাইকে বেশি বেশি বই পড়ার আহ্বান জানান। তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে দিতে প্রকাশকদের তাগিদ দেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের অমর সৃষ্টি *বিষাদ সিন্ধুর* অনুবাদ *ওমেন অব সরো* এবং *হানড্রেড পোয়েমস ফ্রম বাংলাদেশ* বই দুটি তুলে দেওয়া হয়। পরে তিনি 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬' বিজয়ীদের মাঝে বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন ও লেখক-প্রকাশকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ ফেব্রুয়ারি মিরপুর সেনানিবাসের শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে সামরিকবাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) থেকে ২০১৬–১৭ বর্ষে গ্র্যাজুয়েশন করা অফিসারদের মধ্যে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সশস্ত্রবাহিনী একটি দেশের জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের একটি অন্যতম উপাদান। তিনি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি ২০১৬–১৭ কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নত, সমৃদ্ধশালী এবং শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কথাও উল্লেখ করেন।

ইমাম ও আলেমদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় ইমাম সম্মেলন ও শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উচ্ছেদ করে দেশে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে সরকারের জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য ইমাম এবং আলেমদের আরো সোচ্চার হওয়ার তাগিদ দেন। এছাড়া সরকার দেশের সব জেলা-উপজেলায় ইসলামি কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মাটি ও মানুষের বাহিনী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ফেব্রুয়ারি সফিপুর আনসার একাডেমিতে 'বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের জনগণের এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জাতির ক্রান্তিকালে আনসার বাহিনীর সদস্যদের বলিষ্ঠ ভূমিকা স্মরণ করেন এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ গাজীপুরের সফিপুর আনসার একাডেমিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে কেক কাটেন –পিআইডি

মন্ত্রিসভায় বেসামরিক বিমান চলাচল আইন অনুমোদন

সচিবালয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বেসামরিক বিমান চলাচল আইন ২০১৭-এর অনুমোদন দেওয়া হয়। কোনো উপায়ে বিমান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড– এ রকম বিধান রেখে আইনের খসড়া করা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আইনের ৪টি ধারার বলবৎ শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে।

৫৩তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ফেব্রুয়ারি ৫৩তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ৩ দিনের সরকারি সফরে জার্মানি যান। জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। সেখান থেকে তাঁকে মোটর শোভাযাত্রা সহযোগে বার্লিনের ম্যারিয়ট হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সফরকালে তিনি এই হোটেলেই অবস্থান করেন। তিনি জার্মানির মিউনিখে ম্যারিয়ট হোটেলে প্রবাসীদের দেওয়া সংবর্ধনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি হোটেল ব্যারিসার হফ-এ ৫৩তম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সফরকালে তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মারকেলের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশে মিয়ানমারের শরণার্থীদের অস্থায়ী পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতার আহ্বান জানান। এছাড়া বৈঠকে পরস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াবলি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক জোরদার ও উন্নয়ন বিষয়ে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সোনারগাঁও হোটেলে ঢাকা অ্যাপারেল সামিট ২০১৭-এর উদ্‌বোধন শেষে রপ্তানিযোগ্য তৈরি পোশাক পণ্য পরিদর্শন করেন –পিআইডি

আলোচনা করেন। বৈঠকের পর দেশে বিদ্যমান মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট সিস্টেমের আরো আধুনিকায়নে একটি সমঝোতা স্মারক এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে একটি যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানির মিউনিখে সিকিউরিটি কনফারেন্স প্যানেল আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনকে নিরাপত্তার অন্যতম হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে সেদিকে মনোযোগী হতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো 'সোলার নেশন' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরেন।

পোশাকে বৈচিত্র্য এনে নতুন বাজার খোঁজার আহ্বান

হোটেল সোনারগাঁও-এ ২৫ ফেব্রুয়ারি বিজিএমইএ দ্বিতীয়বারের মতো 'ঢাকা অ্যাপারেল সামিট'-এর আয়োজন করে। সামিটের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তৈরি পোশাক পণ্যে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি নতুন বাজার খুঁজতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে শিল্পোদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তৈরি পোশাক কারখানায় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজনের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭-এর খসড়ার অনুমোদন লাভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় যুব কেন্দ্রকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করতে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন। এছাড়াও 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। নতুন যুবনীতিতে যুবদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরই রাখা হয়েছে।

বাংলা বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্য ভাষা শিখতে হবে কিন্তু মাতৃভাষাকে ভুললে চলবে না। তিনি বাংলা ভাষা ব্যবহারে সবাইকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বাংলা শব্দের বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে আরো সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদনঃ সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমসহ ৯ম ওয়েজ বোর্ড গঠন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)'র সাগর-রুনি মিলনায়তনে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ৯ম ওয়েজ বোর্ড প্রণয়নে সরকার কাজ করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকরা যেন এ আইনের আওতায় অকারণে হয়রানি না হন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনী মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন –পিআইডি

সে বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে যে কাঁচের ঘর তৈরি হচ্ছে, সেখানে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে সাইবার অপরাধ দমন প্রযুক্তি ও আইন প্রয়োজন।

মন্ত্রী আরো বলেন, সম্প্রচার আইন এবং সাইবার অপরাধ দমন আইন দেশে গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

অসাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়নের পথে দেশ

তথ্যমন্ত্রী ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল আয়োজিত 'ভাষা আন্দোলনে কমরেড তোয়াহার অবদান ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, সাম্প্রদায়িক স্বৈরশাসনের অন্ধকার ছিঁড়ে অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। আর এ পথ শহিদদের দেখানো।

ভাষা আন্দোলনে কমরেড তোয়াহার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাহান্ন ও একাত্তরের বীর শহিদেরা একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তি আর উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতাকে হত্যা করে যে সাম্প্রদায়িক জঙ্গি চক্রের উত্থান, তা নির্মূল করার মাধ্যমেই শহিদদের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো সম্ভব।

মমত্ববোধই সংস্কৃতির জয়গান

মন্ত্রী ২২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে 'সাংস্কৃতিক ঘাটতি ও প্রগতির অন্ধকার' শীর্ষক গণবক্তৃতায় বলেন, অঞ্চল ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি মমত্ববোধই সংস্কৃতির জয়গান।

তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান, অর্থনীতিতে ঘুষ-দুর্নীতি পরিহার ও দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা দেশকে এগিয়ে নেবে ও সাংস্কৃতিক ঘাটতিও পূরণ করবে বলে উল্লেখ করেন।

চার হাজার বছরের পুরানো বাঙালি সভ্যতাকে বিশ্বের বুকে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনের মতো মীমাংসিত বিষয় নিয়ে বিসংবাদ তৈরি করতে দেওয়া যাবে না। অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে এই তিন অর্জন আমাদের সংস্কৃতির গৌরব। **প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন**

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

১৯ মার্চ ১৯৭১ : বাঙালির প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

জয়দেবপুরের পথ ধর,
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

১৯৭১। উত্তাল বাংলাদেশ। হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার আহ্বান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন চলছে সারাদেশে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর মোকাবিলা করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেন। এই ডাকে সাড়া দিয়ে জয়দেবপুরের জনসাধারণ প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ। গাজীপুরে (জয়দেবপুরে) সংঘটিত হয় প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। একাত্তরের ২৬ মার্চ থেকে আমাদের চূড়ান্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলেও এর পূর্বে ১৯ মার্চ জয়দেবপুরের মাটিতেই সূচিত হয়েছিল বর্বর পাকিস্তানিবাহিনীর বিরুদ্ধে বীর বাঙালির প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ।

এ দিনেই পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙালির পক্ষ থেকে গর্জে উঠেছিল বন্দুক। আর সে কারণেই একাত্তরের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে সমগ্র বাংলাদেশে স্লোগান উঠেছিল– 'জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

ভাস্কর্য: জাগ্রত চৌরঙ্গী, গাজীপুর

সেসময় জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজবাড়িতে (বর্তমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়) অবস্থান ছিল দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। এ রেজিমেন্টের ২৫/৩০ জন ছাড়া সবাই ছিলেন বাঙালি অফিসার ও সৈনিক এবং অধিকাংশই মনে মনে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক।

সেসময় বাঙালিকে চিরতরে দমিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। এরই একটি অংশ চাচ্ছিল কৌশলে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে।

এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ঢাকার ব্রিগেড সদর দফতর থেকে নির্দেশ এল রেজিমেন্টের ৩০৩ ক্যালিবার রাইফেলগুলো সদর দফতরে জমা দিতে হবে। কিন্তু বাঙালি অফিসার সৈন্যরা অস্ত্র জমা দিতে ইচ্ছুক নন। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্যসহ ১৯ মার্চ দুপুরে জয়দেবপুর সেনানিবাসে এসে উপস্থিত হন।

এদিকে পাঞ্জাব সৈন্যরা অস্ত্র নিতে এসেছে– এ খবরটি দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার জনতা লাঠিসোঁটা, তীর-ধনুক-বল্লম হাতে জড়ো হতে থাকেন জয়দেবপুরে। তাদের সংঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় সমরাস্ত্র কারখানা ও মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির শ্রমিক-কর্মচারীরাও। জঙ্গি জনতা ইট-পাথর-গাছ দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। এছাড়া মালগাড়ির একটি ওয়াগন এনে জয়দেবপুর বাজার রেলক্রসিং বন্ধ করে দেয়। জনতার কাতারে কাজী আজিম

উদ্দিন, সালাম ও সেকান্দরসহ অনেকে বন্দুক নিয়ে উপস্থিত হন।

এদিকে ব্যারিকেড দেবার খবর শুনে জাহানজেব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং সেগুলো অপসারণ করার নির্দেশ দেন। জাহানজেব সামনে বাঙালি সৈন্য ও পিছনে পাঞ্জাবি সৈন্য দিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। কিন্তু বাঙালি সৈন্যরা ফাঁকা গুলিবর্ষণ করেন।

এ সময় জনতার মধ্যে থেকে কাজী আজিম উদ্দিন আহমেদ, সালাম ও সেকান্দর প্রমুখ পালটা গুলি করেন।

অপর দিকে টাঙ্গাইল থেকে রেশন পৌঁছে দিয়ে রেজিমেন্টের একটি ৩ টনি ট্রাক জয়দেবপুরে ফিরছিল। এতে হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমানসহ ৫ জন সৈন্য ছিল এবং তাদের সঙ্গে ছিল এসএমজি ও চাইনিজ রাইফেল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭-এর উদ্‌বোধন শেষে মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন –পিআইডি

জয়দেবপুর কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে আসা মাত্র তাদের গাড়ি থামিয়ে জনতা ঘটনার বর্ণনা এবং গুলিবর্ষণের অনুরোধ করেন। জনতার মনোভাব বুঝতে পেরে তারা গুলিবর্ষণ শুরু করেন। এটাই ছিল বাঙালিদের পক্ষ থেকে প্রথম প্রতিরোধ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা।

পরে পাঞ্জাবি সৈন্যরা ব্যারিকেড অপসারণ করে জয়দেবপুর বাজারে প্রবেশ করে এবং কারফিউ ঘোষণা করে। এখানেই গুলিতে নেয়ামত ও মনু খলিফা শহিদ হন। এরপর আরো ব্যারিকেড অপসারণ করে চান্দনা চৌরাস্তায় পৌঁছে পাঞ্জাবি সৈন্যরা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এখানে হুরমত নামে অসম সাহসী এক কিশোর পাঞ্জাবি সৈন্যের রাইফেল কেড়ে নেওয়ার সময় অপর সৈন্যের গুলিতে নিহত হন। এছাড়া কানু মিয়া নামে অপর একজন আহত হয়ে পরে মারা যান।

জয়দেবপুরের প্রতিরোধের কথা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জয়দেবপুরের প্রতিরোধকামী জনতার বীরত্বের কারণে সেসময় সমগ্র বাংলাদেশে স্লোগান উঠেছিল– 'জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। **প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা**

অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌বোধন

১ ফেব্রুয়ারি: রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে অমর একুশে উপলক্ষে মাসব্যাপী বইমেলার উদ্‌বোধনকালে তরুণ-তরুণীদের বিপথগামী হওয়া ঠেকাতে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী চার দিনের 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭' উদ্‌বোধন ও 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬' বিজয়ীদের মাঝে বিতরণ করেন।

জাতীয় কবিতা উৎসব

❑ 'কবিতা মানে না বর্বরতা' –প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় দুদিনের জাতীয় কবিতা উৎসব।

ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

২ ফেব্রুয়ারি: সফররত ফিলিস্তিনের প্রসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার প্রতি বাংলাদেশের জোরালো সমর্থন অব্যাহত থাকবে। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিয়মিত আলোচনার জন্য দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস পালন

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব জলাভূমি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'জলাভূমি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করে'।

বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালিত

৪ ফেব্রুয়ারি: 'আমি পারি, আমরা পারি' –স্লোগানে দেশব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব ক্যানসার দিবস'।

ঢাকায় ই-৯ সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৫ ফেব্রুয়ারি: ঢাকার হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে এসডিজি-৪ লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর কৌশল নির্ধারণে ই-৯ মন্ত্রী পর্যায়ের একাদশ সম্মেলন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ই-৯ ভুক্ত দেশগুলোর উদ্যোগগুলোকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিক্ষা বিষয়ক এসডিজি ৪-এর সঙ্গে সমবায় করে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৬ ফেব্রুয়ারি: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রিজার্ভের অর্থে ১০ বিলিয়ন ডলারের সার্বভৌম তহবিল গঠনের প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

একনেকে আট প্রকল্প অনুমোদন

৭ ফেব্রুয়ারি: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে ৮টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

নিজ নিজ অবস্থান থেকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান: প্রধানমন্ত্রী

৮ ফেব্রুয়ারি: মিরপুর সেনানিবাসের শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে সামরিকবাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) থেকে ২০১৬–১৭ বর্ষে গ্রাজুয়েশন করা অফিসারদের মধ্যে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশিপাশি সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে উদ্যোগী হতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ইমাম ও আলেমদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

৯ ফেব্রুয়ারি: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় ইমাম সম্মেলন ও শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইমাম এবং আলেমদের আরো সোচ্চার হওয়ার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্দেশে জাতীয় সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

১২ ফেব্রুয়ারি: সফিপুর আনসার একাডেমিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) ৩৭তম জাতীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব বেতার দিবস

১৩ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় বিশ্ব বেতার দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'তুমিই বেতার'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

❑ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে বিমান পরিচালনায় বাধা দিয়ে মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেললে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবনের পাশাপাশি ৫ কোটি টাকা জরিমানার বিধান রেখে বেসামরিক বিমান চলাচল আইন ২০১৭-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এছাড়া বৈঠকে বস্ত্রনীতি ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭ নীতিগত অনুমোদিত হয়।

একনেক সভা

১৪ ফেব্রুয়ারি: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় (একনেক) তিন হাজার ৬০০ কোটি টাকার ১১ প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস'।

বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস

১৫ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২০ ফেব্রুয়ারি: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাডারে মুক্তিযোদ্ধা, নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোটা পূরণ না হওয়া সংরক্ষিত পদগুলো ৩৬তম বিসিএস-এর মাধ্যমে পূরণ করা যাবে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ ফেব্রুয়ারি: ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় সারাদেশে পালিত হয় 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান –পিআইডি

অ্যাপারেল সামিটে প্রধানমন্ত্রী

২৫ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে 'ঢাকা অ্যাপারেল সামিট'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তৈরি পোশাক পণ্যে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি নতুন বাজার খুঁজতে এ খাতের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বগুড়ায় প্রধানমন্ত্রী

২৬ ফেব্রুয়ারি: বগুড়ায় সান্তাহারে দেশের দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সোলার বিদ্যুৎ সুবিধাসম্পন্ন ২৫ হাজার টন ধারণ ক্ষমতার বহুতল খাদ্যগুদামের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। **প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক**

নতুন দোলা লাগল মনে

সালাহউদ্দিন

কনকনে শীতের জড়তা কাটিয়ে গাছে গাছে নতুন পাতা আর ফুলের কুঁড়ির সম্ভার নিয়ে এসেছে ঋতুরাজ বসন্ত। পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত প্রকৃতি। মিলনের আনন্দে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে কোকিল কু...উ...কু...উ। বিভিন্ন রঙের ফুল আর আমের মুকুলের সুগন্ধে চারদিক মৌ মৌ করছে। দিনের পরিধি গেছে বেড়ে। বেড়েছে সূর্যের আলোর প্রখরতা। শীত বিদায় নিয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছে। এমন মিষ্টি-মধুর আলো ঝলমল পরিবেশে মানুষের কর্মস্পৃহাও বেড়ে গেছে। শীতের আড়ষ্টতা ভেঙে নব উদ্দীপনায় জেগেছে প্রকৃতি।

এমনই নানা রূপে ছয় ঋতুর শেষ ঋতু বসন্ত ধরা দেয় প্রকৃতিতে। ফাল্গুন-চৈত্র এই দুই মাস নিয়ে হয় বসন্ত ঋতু। এ ঋতুতে প্রকৃতি ভিন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। এর আগের ঋতুটি শীতঋতু। শীতে প্রকৃতি থাকে রুক্ষ, প্রাণিকূল থাকে জড়সড়, অনুপস্থিত থাকে প্রাণের স্পন্দন। এমনকি গাছপালাও শীতে জবুথবু হয়ে থাকে। বসন্তের আগমনে শীত যখন কমে যায় তখন প্রকৃতির নতুন রূপ ফুটে ওঠে। সকলে নতুন করে জেগে ওঠে। মানুষের মনে লাগে সুখের দোলা। বসন্ত আসে হলুদের পসরা নিয়ে। পহেলা ফাল্গুন শহরে-নগরে নারী-পুরুষেরা নতুন হলুদ পোশাক পরে স্বাগত জানায় দিনটিকে। এ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক রকম মেলা বসে। এছাড়া বিভিন্ন শহরে বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিব্যাপী ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বাসন্তি রঙের পোশাক পরিধান করে, বিভিন্ন রকমের ফুল খোপাই মাথা ও গলায় পরে মেলায় ঘুরে ঘুরে বই ক্রয় করে অনেকে। এমনকি ফাল্গুন মাস জুড়েই হলুদ পোশাক পরে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। হলুদ পোশাকে জাবা পোকা বসে বসন্তের বারতা জানায়। বসন্তের আগমনে গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়। আমের মুকুলের গন্ধে চারদিক মেতে ওঠে। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে সবুজ বনানি। নানা রঙের ফুলে প্রকৃতি হয় অপরূপ। প্রজাপতি আর মৌমাছি মধুর নেশায় ছুটাছুটি করে বেড়ায় এ ফুল থেকে ও ফুলে। এ দৃশ্য দেখে শিশু-কিশোর এমনকি বড়োদের মন আনন্দে নেচে ওঠে। এসব সৌন্দর্য উপভোগের নেশায় মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দূর দূরান্তে বেড়াতে।

বসন্তে প্রধানত শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, বকুল, বেলি, রজনীগন্ধা, ডালিয়া, গন্ধরাজ, গাঁদা ফুল ফোটে। এছাড়া এখন নতুন জাতের অনেক ফুল ফুটতে দেখা যায়। নাম না জানা নানা রকম বনফুলে প্রকৃতি বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়।

বাতাসে প্রচণ্ড ধুলার উড়াউড়িও বেড়ে যায় বসন্তে। ফলে ঠাণ্ডা-জ্বর-কাশি রোগের প্রকোপ বাড়ে। বিশেষ করে যাদের অ্যালার্জি সমস্যা আছে তাদের এ সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়।

এসব মিলিয়ে বসন্ত খুব সুন্দর ঋতু। বসন্তে সকালে আকাশে হালকা কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে তা কেটে যায়। ঝকঝকে রৌদ্রজ্জ্বল দিন থাকে। এসময় কাজেকর্মেও মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই তো বসন্তকে ঋতুরাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে এগিয়ে বাংলাদেশ

আমেরিকান থিংক ট্যাঙ্ক হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে ৯ ধাপ এগিয়েছে। বিশ্বের ১৮৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১২৮তম, এশিয়ায় ২৮তম। এ বছর বাংলাদেশ পাকিস্তানকে অতিক্রম করে ৫৫ পয়েন্ট অর্জন করে, যা গত বছরের চেয়ে ১.৭ পয়েন্ট বেশি। ২০১৬ সালে এদেশের অবস্থান ছিল ১৩৭তম।

থানায় মোবাইল ট্র্যাকার

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংগঠিত অপরাধের ঘটনার দ্রুত তদন্ত করার জন্য সরকার রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে মোবাইল ট্র্যাকার

মোবাইল ট্র্যাকার

স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৬৩৩টি থানা এ প্রকল্পের আওতায় পরবে। সাইবার অপরাধ, মোবাইলে হুমকি, অপহরণসহ অনেক অপরাধ কমবে মোবাইল ট্র্যাকার স্থাপনের মাধ্যমে।

মৎস্য আইন অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৭-এর খসড়া অনুমোদন হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, সরকার উপকূলীয় এলাকা বা নদী-মোহনা সংলগ্ন উপযোগী এলাকাকে চিহ্নিত করে মেরিনকালচার অঞ্চল বা জোন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। অনুমোদিত পদ্ধতিতে মৎস্যসহ সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রজাতি চাষে অনুমতিও দিতে পারবে। নতুন আইনে ইচ্ছাকৃতভাবে মৎস্য আহরণের নৌযান ইত্যাদির ক্ষতিসাধনের শাস্তি ৩ বছরের জেল বা ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

বিশ্ব পর্যটনে সাগরপথে যুক্ত বাংলাদেশ

পর্যটন খাত বিকাশে বর্তমান সরকারের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সাগরপথে বিশ্ব পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এর অংশ হিসেবে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রায় একশ পর্যটক নিয়ে শ্রীলংকার কলম্বো থেকে যাত্রা করেছে। বিলাসবহুল জাহাজ সিলভার ডিসকভার প্রথমবারের মতো ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে চট্টগ্রাম বন্দরের সমুদ্রসীমায় পৌঁছেছে। চারদিনের ভ্রমণ শেষে জাহাজটি ভারতের কলকাতায় যাত্রা শেষ করবে।

রপ্তানিতে শীর্ষে ডেনিমের পোশাক

বাংলাদেশের ডেনিমের পোশাক ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান দপ্তর ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইউরোপের বাজারে রপ্তানির

ক্ষেত্রে টানা তিন বছর ধরে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। সাশ্রয়ী দাম আর গুণগতমানে সেরা বলে ডেনিম বিশ্বব্যাপী বেশ জনপ্রিয়।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রথমবারের মতো নারী প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন নারী সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। বেগম কামরুন নাহার ১২ ফেব্রুয়ারি তথ্য অধিদফতরে উক্ত পদে যোগ দিয়েছেন বলে তথ্য অধিদফতরের তথ্যবিবরণীতে জানানো হয়েছে।

বেগম কামরুন নাহার

তথ্যবিবরণীতে বলা হয়, বিসিএস ১৯৮৪ নিয়মিত ব্যাচের এই কর্মকর্তা এর আগে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এরও আগে তিনি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

বিজ্ঞানী তানজিমা হাশেমের পুরস্কার অর্জন

বাংলাদেশের নারী কম্পিউটার বিজ্ঞানী তানজিমা হাশেম ২০১৭ সালের ওডব্লিউএসডি-এলসেভিয়ার ফাউন্ডেশন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। বাংলাদেশ, ইকুয়েডর, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া ও সুদানের পাঁচ নারী গবেষককে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বলে সংস্থাটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক তানজিমা হাশেম মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার কম্পিউটার নির্ভর একটি উপায় বের করেছেন। অনলাইনে বিভিন্ন সেবা নেওয়ার সময় স্বাস্থ্য, অভ্যাস ও অবস্থানের বিষয়ে ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখার জন্যই এ রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন। উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশগুলোর নারী বিজ্ঞানীদের সংগঠন ওডব্লিউএসডি এই পুরস্কার দিয়ে থাকে।

সম্মাননা পেলেন অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী

দেশের নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নাজমা চৌধুরীকে সম্মাননা দিয়েছে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি। সম্প্রতি সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সম্মাননা স্মারক ও উত্তরীয় তুলে দেন নাজমা চৌধুরীকে।

অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী

নাজমা চৌধুরীর হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম নারী উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাঁকে 'রোকেয়া চেয়ার' সম্মাননায় ভূষিত করে। ২০০৮ সালে ভূষিত হন একুশে পদকে। উল্লেখ্য, তাঁর সম্পাদিত বই *উইমেন অ্যান্ড পলিটিকস ওয়াল্ডওয়াইড* ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা হিসেবে আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

জীবনানন্দ দাশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার পেলেন শিপ্রা

'জীবনানন্দ দাশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার ২০১৬' পেয়েছেন তরুণ কবি সালেহীন শিপ্রা। মার্কিন গবেষক অধ্যাপক ক্লিন্টন বি সিলি ও বাংলাদেশের প্রথমা প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতিবছর।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩০ বছরের কম বয়সি তরুণ কবিদের কাছে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে বিচারকমণ্ডলী কবি সালেহীন শিপ্রার 'প্রকাশ্য হওয়ার আগে' পাণ্ডুলিপি পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেন।

নারীদের মাঝে ভিজিডি কার্ড বিতরণ

নারীদের সম্মানিত করলে দেশ এগিয়ে যাবে। আর এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রতিটি কাজে নারীদের সম্মানিত করছে। ২ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের কালীগঞ্জে নারীদের মাঝে ভিজিডি কার্ড বিতরণকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি একথা বলেন।

লাঠিয়াল রুপন্তী

রুপন্তীর প্রতিপক্ষ একজন পুরুষ। হাজার দর্শকের মাঝে রুপন্তী চৌধুরীর লাঠি ও তলোয়ার চালানোর নানা কৌশল দর্শকদের মুগ্ধ করছিল বার বার। হাততালি আর হর্ষধ্বনিতে জমজমাট ছিল উৎসব প্রাঙ্গণ। ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ায় আয়াজন করা হয়েছিল

লাঠি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে রুপন্তী

ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা উৎসবের। দেশের বিভিন্ন জেলার ২৫টি দলের প্রায় ৫০০ লাঠিয়াল এ দুদিনের উৎসবে অংশ নেয়। এসব দলে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারীরা ছিলেন। এদের মধ্যে মঞ্জুরীন সাবরীন চৌধুরী রুপন্তী একজন। উৎসবের আয়োজন করে 'বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী' নামের সংগঠন।

লাঠিয়াল পরিবারের মেয়ে রুপন্তীর লাঠি খেলায় হাতেখড়ি বাবা রতন চৌধুরীর হাত ধরে। দাদা সিরাজুল ইসলামও লাঠিয়াল ছিলেন। কলেজ পড়ুয়া রুপন্তীর মতে, শুধু খেলাই নয়, লাঠিখেলা আত্মরক্ষার কৌশলও বটে। বিশেষ করে নারীদের আত্মরক্ষার জন্য।

উল্লেখ্য, রুপন্তীর ফুফু হাসনা বানু দেশের প্রথম নারী লাঠিয়াল।

কাতারে নারী গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় আইন

প্রথমবারের মতো নারী গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় একটি আইনের খসড়া অনুমোদন করেছে কাতার। সম্প্রতি মন্ত্রিসভা খসড়াটিকে আইনে পরিণত করতে সম্মতি দিয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম *কাতার নিউজ এজেন্সি*।

নিউজ এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, এ আইন গৃহকর্মী ও তাদের চাকরিদাতাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশিত হবে এবং গৃহকর্মীদের দায়িত্ব ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ইউনিভার্সিটির ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন – পিআইডি

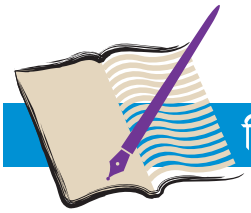

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সৃজনশীল ও আলোকিত মানুষ তৈরির মান নিশ্চিত করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি'র ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি প্রতিটি ইউনিভার্সিটিতে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করে দেশপ্রেমিক ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শুধু সার্টিফিকেটমুখী শিক্ষা নয়, সৃজনশীল ও আলোকিত মানুষ তৈরির জন্য উচ্চশিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মান নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রপতি শিক্ষাকে মুনাফা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ ফেব্রুয়ারি হোটেল রেডিসন ব্লুতে তিন দিনব্যাপী ই-নাইনভিত্তিক দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার এবং এই পেশার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে নীতিগত উপায় উদ্ভাবন এবং বিশেষ প্রণোদনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি ইউনেস্কোর ই-নাইনভিত্তিক দেশগুলোর উদ্যোগগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সঙ্গে সমন্বয় করে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন করার আশ্বাস

সবার জন্য শিক্ষা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু কর্মপন্থা ঠিক করেছে ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক একটি বড়ো কার্যক্রম ই-নাইন। এ লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশসহ ই-নাইনভুক্ত দেশগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে এই কর্মপন্থা সফল করার চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি ইউনেস্কো এ বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করবে বলে আশ্বস্ত করেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন।

ডিইউ'র অধিভুক্ত হলো ঢাকার সাত কলেজ

প্রথম দফায় রাজধানী ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডিইউ) অধিভুক্ত করা হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এখন থেকে অধিভুক্ত এই কলেজগুলোর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া ও পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিচালিত হবে। কলেজগুলো হলো– ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

উল্লেখ্য সরকারি নির্দেশনানুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সরকারি কলেজগুলো সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়া শুরু হয়। **প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধী শিশুদেরও স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন

প্রতিবন্ধী শিক্ষানীতিতে সকল শিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকেও সমান অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে। তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তার সীমাবদ্ধতার মাঝেও সে দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারা একীভূতকরণ বিষয়ক নীতিমালার রূপরেখা প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালার সমাপনি

কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিশু

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে একথা বলেন। মন্ত্রী আরো বলেন, স্বাভাবিক সন্তানের মতোই সমান সুযোগ, যত্ন ও স্নেহ-মমতা দিয়ে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ শিশুদের বড়ো করতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকার সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়ে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার কথা তিনি জানান।

মন্ত্রী প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্টদের বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হবে। প্রতিবন্ধীদের করুণার দৃষ্টিতে নয় বরং তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে সরকার বদ্ধপরিকর

দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (এনএএএনডি)-এর প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর সালমা বেগম একথা বলেন। তিনি বলেন, 'অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারা একীভূতকরণ বিষয়ক নীতিমালার রূপরেখা প্রণয়ন'-এর কাজ দ্রুত চলছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় সভা, আলোচনা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রতিবেদন : হাছিনা বেগম

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

আইসিডিডিআরবি'র দুটি আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন

চিকিৎসা খাতে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইসিডিডিআরবি)। এর একটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পোলিও রিসার্চ কমিটির (পিআরসি) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আইসিডিডিআরবি'র সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. কে. জামান আর অন্যটি হচ্ছে কলেরার বিরুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নিয়ে *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস*-এ প্রতিবেদন প্রকাশ। আইসিডিডিআরবি'র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ড. কে. জামান গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন (ওপিভি) নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি পিআরসি'র সদস্য হিসেবে আগামী ১৯ এপ্রিল কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন। এছাড়া কলেরার বিরুদ্ধে আইসিডিডিআরবি'র যুদ্ধ এবং আধুনিক ও নতুন উদ্ভাবিত চিকিৎসার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বাঁচানোর ভূমিকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী *দ্য নিউইয়র্ক টাইম* ৬ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে আনে।

বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর নতুন ওষুধ উদ্ভাবন

হেপাটাইটিস-বি চিকিৎসায় নতুন ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানী শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর। জাপানের তোশিবা জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল সায়েন্সেস বিভাগের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর তিনি। সম্প্রতি মিডিয়ায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

'নাসভ্যাক' নামের উদ্ভাবিত এই ওষুধটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে বাংলাদেশে। দেশে এ কাজে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মামুন আল মাহতাব। তিনি মিডিয়াকে জানান, 'নাসভ্যাক' মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম।

ক্যানসার দিবস পালন

ক্যানসার মোকাবিলায় সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে জনসচেতনতা। ক্যানসার রোগীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। তাদের মানসিক যত্ন দেওয়া খুব দরকার। ৪ ফেব্রুয়ারি ক্যানসার দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চিকিৎসক ও নাগরিক প্রতিনিধিরা এসব কথা বলেন।

প্রতিবছর ১ লক্ষ ৪১ হাজার মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে। পুরুষের ফুসফুসের ও নারীর স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি বলে অনুষ্ঠানে তথ্য জানানো হয়েছে।

ঢামেক-এ শয্যা সংখ্যা দ্বিগুণ করার ঘোষণা

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) শয্যা সংখ্যা দ্বিগুণ করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। ৭ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ঢামেক হাসপাতালের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী হাসপাতালের বর্তমান স্থাপত্যশৈলী বজায় রেখে এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ করা হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে এ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হেলথ কার্ড বিতরণ

'জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা, কমিউনিটি ক্লিনিক করবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা' এ–স্লোগানকে সামনে রেখে দেশে প্রথমবারের মতো ৩৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ময়মনসিংহের ত্রিশালে সম্প্রতি এ কার্ড বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রথমবারের মতো বিতরণকৃত হেলথ কার্ড প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ

এ কার্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা সব কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনামূল্যে ওষুধ, চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে পারবেন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগে এ কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানা গেছে।

৬৫০ চিকিৎসক পেলেন বিশেষ প্রশিক্ষণ

হৃদরোগ চিকিৎসার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের ৬৫০ জন হৃদরোগ চিকিৎসক। ঢাকা ও কলকাতার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের আয়োজনে ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনের সমাপ্তি হয় ১২ ফেব্রুয়ারি।

এ প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা হাতে-কলমে নবীনদের হৃদরোগে অস্ত্রোপচারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ও চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার শিখিয়েছেন। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, ভারতের বিশেষজ্ঞ শল্যবিদগণও উপস্থিত ছিলেন।

সরকার ও দেশের স্বাস্থ্য খাত

রিফাত জাফরীন

যে-কোনো দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, প্রবৃদ্ধি এবং সফলতা সে দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তাদের স্বাস্থ্য খাতকে বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে আসে বলেই সূচকের শীর্ষে অবস্থান করে।

যদিও স্বাস্থ্য খাতের সাথে জনসংখ্যার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তথাপি উন্নত দেশগুলো তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পেরেছে দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য।

আমাদের দেশ উন্নয়নশীল একটি দেশ হলেও জনসংখ্যার চাপে দেশটি ভারাক্রান্ত। এত সীমিত সম্পদ দিয়ে এত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আমাদের দেশের মতো একটি দেশের জন্য সত্যিই কঠিন।

সরকার প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যার এ দেশে স্বাস্থ্য সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলস এবং আন্তরিকতার সাথে। কঠিন এ চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করে অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক নানা পুরস্কার। প্রশংসিত হয়েছে স্বাস্থ্য খাত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কাজের জন্য। শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার ও গ্যাভি পদক এবং নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির সফল ব্যবহারের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১১ সালে 'সাউথ-সাউথ' পুরস্কার অর্জন করে।

বর্তমানে মাতৃমৃত্যু হার লাখে ১৭০ জন। শিশুমৃত্যু হার হাজারে ২৯ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতা ৬২.৪ শতাংশ। ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৫,৭৩০ জন চিকিৎসকসহ ৪৫ হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। চালু হয়েছে ১৩,১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক। এ ক্লিনিকগুলো থেকে এ পর্যন্ত ১২ কোটি গ্রহীতা সেবা পেয়েছে। আটটি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে এবং আরো ২১টি নির্মাণাধীন রয়েছে। নতুন চারটি মেডিকেল কলেজ, সাতটি নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৫টি মেডিকেল কলেজে আইসিইউ ও ক্যাজুয়ালটি সুবিধা এবং ৩টি জেলা হাসপাতালে সিসিইউ স্থাপিত হয়েছে। ১২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং আরো ২৯০টি ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। ১৩৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। হাসপাতালে মোট শয্যা বেড়েছে প্রায় ৫,০০০। সরকারি হাসপাতালে শতাধিক রকমের ওষুধ বিনামূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ৮০০টি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ৪৮২টি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা এবং আটটি হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২ সহ তামাক বিরোধী আইন অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্য খাতের সেবা জনসাধারণের জন্য আরো সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান সরকার দেশের সীমিত সম্পদ এবং অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর বিষয়ে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে সরকারের এ অগ্রযাত্রা সর্বদা চলমান থাকবে এমন আশাবাদ আজ আর সুদূর পরাহত নয়।

ওষুধ শিল্প পার্কে কারখানা স্থানান্তরের আহ্বান

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় স্থাপিত পরিবেশবান্ধব ওষুধ শিল্প পার্কে কারখানা স্থানান্তরে ওষুধ কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। 'স্যামসন এইচ চৌধুরী স্মৃতি সম্মেলন ২০১৭' উপলক্ষে ঢাকা ক্লাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে ওষুধ কারখানা স্থাপন না করে ওই পার্কে আপনারা উৎপাদন কারখানা স্থানান্তর করুন। সরকার আপনাদের সহায়তা করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেন।

রোগীদের জিম্মি করে ধর্মঘট নয়

কোনো অভিযোগেই রোগীদের জিম্মি করে ধর্মঘট না করতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। ১৫ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।

একই সঙ্গে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তাদের ওপর হামলা ও হাসপাতাল ভাঙচুর না করে তা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলকে জানানোর জন্য রোগী ও তার স্বজনদের প্রতিও আহ্বান জানান মন্ত্রী। **প্রতিবেদন: আশরাফ উদ্দিন**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রাত ১২টা ১ মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও তারপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

বেঙ্গল সংস্কৃতি উৎসব

সিলেট নগরের মাছিমপুরে ২২ ফেব্রুয়ারি আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গল সংস্কৃতি উৎসব। এদিন ছিল উৎসবের প্রথম দিন। দেশ-বিদেশের ৩৮৩ জন্য সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, চিত্রকর, নাট্যকুশলী ও লেখক এ উৎসবে অংশ নেন। উৎসবটি উৎসর্গ করা হয় জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাককে। ইনডেক্স গ্রুপ নিবেদিত এ উৎসবের আয়োজন করে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন।

একুশে পদক প্রদান

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২০ ফেব্রুয়ারি স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে বিশিষ্ট কয়েকজন গুণীজনকে একুশে পদক প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসেবে সনদ, স্বর্ণপদক এবং দুই লাখ টাকার চেক প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের হাতে তুলে দেন। যেসব বিভাগে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে– ভাষা আন্দোলন, শিল্পকলা (সংগীত,

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য, নাটক ও নৃত্য), সাংবাদিকতা, গবেষণা, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা, ভাষা ও সাহিত্যে।

মুক্তির উৎসব ২০১৭ উদ্‌যাপন

'আমাদের অঙ্গীকার অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণ' –স্লোগান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'মুক্তির উৎসব ২০১৭'-এর আয়োজন করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২০০২ সাল থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করে আসছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ১০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং শিক্ষার্থীরা অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ নির্মাণের শপথ গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্যদিয়ে মেতেছিল মুক্তির উৎসব।

এশিয়ার সর্ববৃহৎ আলোকচিত্র উৎসব শুরু

ঢাকায় ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো আলোকচিত্র উৎসব ছবিমেলা। এ প্রদর্শনীতে ১৬ দেশের ২৭ জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে ২৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'মুক্তির উৎসব ২০১৭' অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে ক্যালিক্স ললিতকলা একাডেমির শিক্ষার্থীরা

শিল্পীর আলোকচিত্র স্থান পায়। দুই সপ্তাহব্যাপী মেলায় ছিল পাঁচটি কর্মশালা, পোর্টফোলিও রিভিউ, শিল্পীদের সঙ্গে সংলাপ, প্যানেল, আলোচনা ও উপস্থাপনা। শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে মেলা উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

ডিজিটাল বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল-এ যুক্ত হলো বাংলাদেশ

বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল কুয়াকাটা ল্যান্ডিং স্টেশনে যুক্ত হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সি-মি-ইউ-৫ কনসোর্টিয়ামের বৈঠকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হওয়া বিষয়টি উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল লিমিটেড (বিএসসিসিএল) কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হওয়ায় অতিরিক্ত ১ হাজার ৫০০ গিগাবাইটের (জিবি) বেশি ব্যান্ডউইথ পাচ্ছে বাংলাদেশ।

একটি কনসোর্টিয়ামের আওতায় সি-মি-ইউ-৫ সাবমেরিন ক্যাবলে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ১৭টি দেশ সংযুক্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তি করে বাংলাদেশ।

শিশু একাডেমিতে ঢাকা ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও বিভাগীয় ব্র্যান্ডিং মেলা ২০১৭। তিন দিন ধরে চলা এ মেলার উদ্‌বোধন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প এ মেলার আয়োজন করে।

জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া, সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, এসডিজি কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের যৌথ অংশগ্রহণে সেদিন একটি মতবিনিময় সভাও হয়। স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং জনগণের অংশীদারিত্ব বাড়াতে এ মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলা ভাষা, আসছে ১৬টি বাংলা টুলস

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করবে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি)। গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষা সহায়ক ১৬টি টুলস তৈরি করবে সরকার। এসব

সফটওয়্যার ও টুলসের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক স্পেসিফিকেশনও করা হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। টুলসগুলোর মধ্যে রয়েছে– বাংলা কার্পাস, বাংলা ওসিআর, বাংলা স্পিচ টু টেক্সট, টেক্সট টু স্পিচ, জাতীয় বাংলা কী-বোর্ড, বাংলা স্টাইল গাইড, বাংলা ফন্ট, বাংলা মেশিন প্রন্সিলেটর ইত্যাদি।

প্রযুক্তিনির্ভর দেশ গড়তে সরকার বদ্ধপরিকর

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রাজধানীর কম্পিউটার কাউন্সিলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ইন ডিজিটাল এজ' শীর্ষক কর্মশালায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, নিজেদের দেশকে প্রযুক্তি খাতে সব সময় এগিয়ে রাখতে আমরা এমআইটির মতো গবেষণা সংস্থার সঙ্গে অধিক মাত্রায় পারস্পরিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চাই। বর্তমান সরকারের আমলে দেশ তথ্য ও প্রযুক্তির সব খাতেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আয়োজিত ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ইন ডিজিটাল এজ শীর্ষক সেমিনারে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ছত্রাকসহিষ্ণু আলু চাষে সফলতা

ছত্রাক বা লেট ব্লাইটসহিষ্ণু আলুর দুটি জাতের পরীক্ষামূলক চাষে সফলতা পেয়েছেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। ছাত্রকনাশক ছাড়াই 'অ্যালুয়েট' ও 'ক্যারোলাস' নামের ওই দুটি আলু অন্য আলুর চেয়ে ফলনও দ্বিগুণ দিচ্ছে।

মাঠ পরিদর্শনে আসা দেবীগঞ্জ প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড.আশিষ কুমার সাহা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, লেট ব্লাইট (নাবি ধসা) আলুর একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের

ছত্রাক সহিষ্ণু দুটি নতুন জাতের আলু

কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ৩০ শতাংশ আলুর ফলন হ্রাস পায়। আর গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ দেখা দিলে ৮০ শতাংশেরও বেশি ফলন হ্রাস পাওয়ার আশংকা থাকে। আলুর এ রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবছর পাঁচ হাজার টনের বেশি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হয়। আমদানিনির্ভর এই ছত্রাকনাশকের মূল্য ৫০০ কোটি টাকারও বেশি।

প্রতিবছর দেশে প্রায় পাঁচ লাখ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। খেতে সুস্বাদু এই দুই জাতের আলুর আবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লে একদিকে উৎপাদন দ্বিগুণ হবে আবার অন্যদিকে ছত্রাকনাশক আমদানি বাবদ ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

সীতা লাউ ফলন দিবে দশ বছর পর্যন্ত

কৃষি বিপ্লবে যুক্ত হলো আরেকটি নতুন পালক। কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানীরা 'সীতা লাউ' নামের নতুন এক জাতের লাউ উদ্ভাবন করেছেন। কোনো সুনির্দিষ্ট মৌসুম ছাড়াই একবার রোপণের পর ১০ বছর পর্যন্ত একই লতা থেকে ১২ মাসই পাওয়া যাবে সবুজ সীতা লাউ।

রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সীতা লাউ গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সীতা লাউয়ের চাষ হলেও বাংলাদেশে এই লাউ এখনো ততটা বিস্তৃতি লাভ করেনি। ১২ বছর গবেষণার পর বারি সীতা লাউ-১ নামের একটি জাত উদ্ভাবন ও চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে।

পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সীতা লাউয়ের উৎপাদন দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা হলে গ্রীষ্মকালে সবজির চহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। পরিচর্যা ভালো করতে পারলে গাছ ১০–১৫ বছর পর্যন্ত ফল দিতে সক্ষম। চারা লাগানোর ৫–৬ মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসে এবং ফুল ফোটার ২৫–৩০ দিনের মধ্যে ফলের ওজন ৪০০ থেকে ৮০০ গ্রাম হয়। একটি গাছ থেকে বছরে ২০০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

পিট পদ্ধতিতে বালুরাজ্যে কুমড়া বিপ্লব

বালুরাজ্যে যেখানে কোনো ধরনের ফসলই উৎপাদন সম্ভব হতো না, সেখানেই দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত হচ্ছে কুমড়াসহ বিভিন্ন জাতের সবজি। এক দশক আগে প্রথম গাইবান্ধা জেলার যমুনার চরের বালুতে ১৭৭ জন চাষি পিট পদ্ধতিতে ১১টি স্থানে কুমড়াসহ অন্যান্য সবজি চাষের প্রক্রিয়া শুরু করেন। প্রথম বছরেই উৎপন্ন হয় ৬৩ হাজার কুমড়াসহ অন্যান্য সবজি।

২০০৯ সালে সরকার ও ডিএফআইডির 'ইইপি সিঁড়ি প্রকল্প'-এর মাধ্যমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচটি জেলায় কাজের গতি আরো বেড়ে যায়। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ 'পাথওয়েজ ফ্রম পোভার্টি' প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বশেষ ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল

পর্যন্ত ১৬ হাজার ৭০০ ভূমিহীন চাষির মাধ্যমে তিন হাজার চার হেক্টর বালুচর চাষের আওতায় আনা হয়। এক্ষেত্রে প্রায় ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের সুবাদে ৯১ হাজার ৭৯৯ মেট্রিক টন মিষ্টিকুমড়ার ফলন হয়, যার স্থানীয় বাজারমূল্য ৭১ কোটি টাকা এবং শহরের বাজারমূল্য ১৪৩ কোটি টাকা। **প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বৃত্তির অর্থ বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশেষ এলাকার উন্নয়নের জন্য ২০১৬–২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দের অর্থ সম্প্রতি পার্বত্য জেলা বিয়াড়া পল্লির ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। তিন ক্যাটাগরিতে ৪৯ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে দুই লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বাবার পেশাই ছেলের পেশা প্রথা ভাঙছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

যোগ্য নাগরিক ও লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাগ্যোন্নয়নে দক্ষ-শিক্ষিত জনবল হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। সমতল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। 'বাবার পেশাই ছেলের পেশা'–এই প্রথা ভাঙছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা। এই গোষ্ঠীর প্রায় প্রতিটি পরিবারের সন্তানই এখন লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকছে। ইতোমধ্যে অনেকে সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ছয়টি ভাষার বর্ণ নিয়ে মিছিল ও সমাবেশ

ছয়টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষার বর্ণমালা নিয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম নগরে মিছিল ও সমাবেশ করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের সামনে এ সমাবেশ হয়। এতে অংশ নেয় চাকমা, মারমা, ম্রো, চাক, তঞ্চঙ্গ্যা, সাঁওতাল।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সব সত্তার মানুষের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং দেশের ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে আরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান সমাবেশে উপস্থিত বক্তারা। **প্রতিবেদন: মো. জাকির হোসেন**

ছয়টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষার বর্ণমালা নিয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ চট্টগ্রাম নগরে মিছিল ও সমাবেশ করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রথম চার লেন সড়ক হচ্ছে সিলেট নগরে

বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে সিলেট নগরে প্রথমবারের মতো চার লেন সড়ক নির্মাণ করছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। নগরের দক্ষিণ সুরমা অংশে কিন ব্রিজ থেকে মুক্তিযোদ্ধা চত্বর হয়ে হুমায়ুন রশীদ চত্বর পর্যন্ত রাস্তা চার লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। সেই সাথে কিন ব্রিজ থেকে ঝালোপাড়া হয়ে মুক্তিযোদ্ধা চত্বর পর্যন্ত রাস্তা দুই লেনে উন্নীতকরণ ও হুমায়ুন রশীদ চত্বর থেকে শিববাড়ি হয়ে বন্দরঘাট পর্যন্ত আরসিসি 'ইউ'-টাইপ ও বক্স ড্রেন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই তিনটি প্রকল্পের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ তিনটি প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে ৩৩ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় এ উন্নয়ন কাজ চলছে। **প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

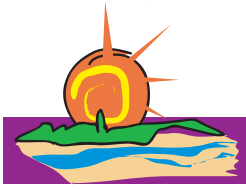

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

দূষিত বায়ুর শীর্ষ ১০ দেশ

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিশ্বজুড়ে একযোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি 'বৈশ্বিক বায়ু পরিস্থিতি–২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে দূষিত বায়ু নির্গমনে শীর্ষ ১০টি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে বায়ুদূষণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ভারত ও বাংলাদেশে। বিশ্বে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ভারতের দিল্লি। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ঢাকা। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের করাচি ও চীনের বেইজিং। বায়ুতে অনেক উপাদান আছে, তার মধ্যে বায়ুদূষণের জন্য দায়ী উপাদানকে বলা হয় পার্টিকুলেট ম্যাটার্স বা সংক্ষেপে পিএম। বাতাসে ভাসমান পার্টিকুলেট ম্যাটার বা পিএম পরিমাপ করা হয় প্রতি ঘনমিটারে মাইক্রোগ্রাম (পিপিএম-পার্টস পার মিলিয়ন) এককে। এসব বস্তুকণাকে ১০ মাইক্রোমিটার ও ২.৫ মাইক্রোমিটার ব্যাস শ্রেণিতে ভাগ করে তার পরিমাণের ভিত্তিতে ঝুঁকি নিরূপণ করেন গবেষকরা। মানবদেহের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক পার্টিকুলেট ম্যাটার্স হচ্ছে পিএম ২.৫ (যে পার্টিকুলেট ম্যাটারের পরিধি ২ দশমিক ৫ মাইক্রনের কম)। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশনের মতে, চীন পিএম ২.৫ সবচেয়ে বেশি নির্গত করত। দূষিত বায়ুর শীর্ষে আছে যে ১০টি দেশ সেগুলো হলো– ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, নাইজেরিয়া, আমেরিকা, জাপান, ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৪ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস। এবারের বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'বন্যপ্রাণী রক্ষায় তরুণদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই'। এ উপলক্ষে বন ভবনে আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠানের। সেখানে বন ও পরিবেশমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু উপস্থিত ছিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর সব দেশই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে আমাদের সমস্যা সবার এক। সবাইকে মিলেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তবে সবার আগে নিজেদের চিন্তা করতে হবে। আমরা নিজেদের অর্থে কতটুকু কাজ করতে পারি– সে বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তন খাতে কাজ করতে নিজস্ব তহবিলের যোগান বাড়াতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, শুধু বন্যপ্রাণী নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। সব ক্ষেত্রে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে পারলে একদিন আমরা সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পারব। **প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

ভূমিকম্প: প্রাথমিক প্রস্তুতি

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

ভূমিকম্প হলে আপনি কী করেন? টের পাওয়া মাত্র হুড়াহুড়ি করে নিচে নামেন, একটা খালি জায়গায় সবাই জড়ো হন, মোবাইল ফোনে বন্ধু-পরিজনের কাছে ভূমিকম্পের খবর জানেন, আপনি কীভাবে কম্পন টের পেলেন তা অন্যদের বলতে থাকেন আর সময় সুযোগ পেলে ভূমিকম্প মোকাবিলায় সরকার কী করেছে, কী করেনি ইত্যাদি বয়ান দেন। এটাই কি সবকিছু?

একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে ভূমিকম্প থেকে আপনার নিজেকে রক্ষায় আপনার প্রস্তুতি কতটুকু? একবার চিন্তা করুন।

রাতে বড়ো ধরনের ভূমিকম্প হলে বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যুৎ চলে যাবে। আপনার শিয়রে কী একটি টর্চলাইট রাখেন? আপনার নামার সিড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। আপনার বাসার ফ্লোর থেকে বের হওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা আছে? যেমন ধরুন, ঘরের একপাশে সিড়ি, পিছনের জানালা দিয়ে বের হওয়া বা উদ্ধার পাওয়ার জরুরি নির্গমন দরজা?

ভূমিকম্পে বাসার বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে বা গ্যাসের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে আগুন ধরে গেল। আপনার পরিবারকে বাঁচাতে বাসায় কি আগুন নিবারক যন্ত্র (ফায়ার ইস্টিংগুইসার) আছে?

ভূমিকম্পের সময় আপনি যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েছেন তা কি নিরাপদ? একবারও কি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন মাথার উপরে বা আশপাশে বিদ্যুতের তার আছে কি-না যেটা ছিঁড়ে গেলে বা পাশের বিল্ডিংটা আচমকা ভেঙে পড়তে থাকলে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন? আবার গ্যাসের লাইনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ১৯৯৫ সালে জাপানে হানসিন আওয়াজি ভূমিকম্পে কুবে শহরে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন মিনিটে দৈত্যাকারের ৫৭টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। পুরো শহর নিমিষেই পুড়ে ছাই।

আপনি নতুন যে দালানটা বানাচ্ছেন তার সিঁড়ি দালানের ভিতরে থাকলে কী লাভ আর বাইরে থাকলে কী লাভ ভেবে দেখেছেন?

আপনি যে বাসায় বা অফিসে থাকেন সেখানে অনেক উঁচু উঁচু আলমিরা আছে। একবার ভেবে দেখেছেন ভূমিকম্প হলে এগুলো ছিটকে এসে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে? জাপানে ভূমিকম্পে হতাহতের শতকরা সাত ভাগ হতো আসবাবপত্রের আঘাতে। তারা এখন বড়ো বড়ো আসবাবপত্র দেয়াল বা মেঝের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকে রাখে।

আসুন, সবাই মিলে একটু ভাবি। ভূমিকম্প সহনশীল দেশ গঠনে আগে নিজেকে প্রস্তুত করি, তারপর সমাজ। এভাবেই হয়ে উঠি ভূমিকম্প মোকাবিলায় রোল মডেলের দেশ।

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশি ১০ ছবি কলকাতায়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসবে বাংলাদেশের নির্মাতাদের তৈরি *আয়নাবাজি* সহ ১০টি চলচ্চিত্র প্রর্দশিত হয়।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ ও নন্দনের আয়োজনে উৎসব শুরু হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, শেষ হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি। নির্মাতা গৌতম ঘোষ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত দেশের নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম। এ ছবিগুলো নন্দন হল ১ ও ৩-এ দেখানো হয়। এ উৎসবের পর্দা উঠে আবু সাইয়ীদের *কীর্তনখোলা* প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে। প্রথম দিনের প্রদর্শনীতে আরো থাকে মোরশেদুল ইসলামের *অনিল বাগচীর একদিন*। দ্বিতীয় দিন দেখানো হয় আবু শাহেদ ইমনের *জালালের গল্প* এবং অমিতাভ রেজার *আয়নাবাজি*। তৃতীয় দিনে দেখানো হয় আহসান কবির লিটনের *প্রত্যাবর্তন* ও মোরশেদুল ইসলামের *আমার বন্ধু রাশেদ*। শেষ দিনে দেখানো হয় শবনম ফেরদৌসীর প্রামাণ্যচিত্র *ভাষাজয়ীতা*, খন্দকার সুমনের *পৌনঃপুনিক*, তাসমিয়া আফরিন মৌ-এর *কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি* ও নুরুল আলম আতিকের *ডুব সাঁতার*।

তামিল ছবিতে মিষ্টি জান্নাত

সজল আহমেদ পরিচালিত *আমার প্রেম তুমি* ছবিতে ওপার বাংলার জনপ্রিয় তারকা সোহমের বিপরীতে বাংলাদেশের নায়িকা জান্নাত অভিনয় করেন। তবে এবার দেশের সীমানা পেরিয়ে তামিল সিনেমায় অভিনয় করেন মিষ্টি জান্নাত। ছবিটির নাম *রংবাজ খিলারি*। সত্য প্রকাশ পরিচালিত এ সিনেমায় মিষ্টির বিপরীতে অভিনয় করেন তামিল নায়ক রাকেশ ও বান্টি ব্যানার্জি। এতে নৃত্য পরিচালনা করেন খালিশ। অ্যাকশন পরিচালক খোকন শর্মা। ছবিটি তামিল ও ভোজপুরি ভাষায় মুক্তি পাবে।

এদিকে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে তুই *আমার রানী* শিরোনামের ছবিটি।

এ চলচ্চিত্রে মিষ্টির বিপরীতে অভিনয় করেন কলকাতার অভিনেতা সূর্য। চলচ্চিত্রটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশের সজল আহমেদ ও ভারতের পীযুষ সাহা।

সরকারি অনুদানে নির্মিত *ভুবন মাঝি*

সরকারি অনুদানে নির্মিত *ভুবন মাঝি* চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন ওপার বাংলার অভিনেতা পরমব্রত ও বাংলাদেশের অপর্ণা ঘোষ। ছবিটি পরিচালনা

ভুবন মাঝি ছবির মহরত অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীরা

করেছেন পরিচালক ফাখরুল আরেফিন। এতে অপর্ণা অভিনয় করেন পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভ্রান্ত ঘরের এক তরুণী ফরিদা চরিত্রে। আর পরমব্রতকে দেখা যাবে লালন ভাবাদর্শের নহির বাউলের ভূমিকায়। আরো অভিনয় করেন মামুনুর রশীদ, নওশাবা, সুষমা সরকার, কণ্ঠশিল্পী ওয়াকিল প্রমুখ।

কলকাতায় চিত্রনায়ক আমান

শেষ বেলা ছবিতে অভিনয় করেন চিত্রনায়ক আমান। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী পায়েল মুখার্জী। ভিষণ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে এ ছবিটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন সুশান্ত মণ্ডল ও বিষ্ণু। এ ছবিতে আরো অভিনয় করেন লিলি চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎসহ অনেকে। **প্রতিবেদন: মিতা খান**

১০৯২১ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ

গ্রামীণ দরিদ্র ও অনগ্রসর নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দেশের ৪২৬টি উপজেলার ২ লাখ ১৭ হাজার ৪৪০ জন নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন বছর এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ পর্যায়ে নারীদের জন্য ২৫০ কোটি টাকার আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প নিয়েছে সরকার।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন একনেকের চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেগুলো হলো– ফ্যাশন ডিজাইন, ট্যুরিস্টগাইড, বিউটিফিকেশন, বিক্রয় কর্মী, মৌ ও মাশরুম চাষ, অভ্যর্থনা কক্ষ ব্যবস্থাপনা, মোবাইল সার্ভিসিং ও মেরামত, টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, কেঁচো সার, ক্রিস্টাল শো-পিস, শতরঞ্জি, প্যাকেট, মোমবাতি, উলের পোশাক তৈরি। বিভাগীয় শহর থেকে ১ হাজার ৪৪০ জন নারীকে গাড়ি চালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৬৪টি জেলা শহরে ১১ হাজার ৫২০ জনকে টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এসি, ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক সম্মানী ভাতা দেওয়া হবে।

যৌতুক আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন

যৌতুক দাবি বা লেনদেনের দায়ে শুধু জেল-জরিমানা নয়, যৌতুকের জন্য কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন সংশোধন করছে সরকার। যৌতুকের শাস্তি বাড়িয়ে 'যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৭'-এর সংশোধনের খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্র মতে, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুক দাবি ও লেনদেনের শাস্তি নির্দিষ্ট করা থাকলেও যৌতুক চেয়ে নির্যাতনের শাস্তি নিয়ে কিছু বলা ছিল না। আইনের খসড়া অনুযায়ী কোনো নারী স্বামী, স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য কোনো নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করলে যাবজ্জীবন করাদণ্ড, মরাত্মক জখম করলে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সর্বনিম্ন ১২ বছর সশ্রম করাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

সিসি ক্যামেরার আওতায় আসছে ডিএনসিসি

ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার আওতায় আসছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। কূটনৈতিক এলাকাসহ পুরো করপোরেশন এলাকায় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য ৫ হাজার সিসি ক্যামেরা কেনা হবে। এ খাতে ব্যয় হবে ৪২৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুরু হয় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ। এ কর্মসূচি আওতায় প্রায় ১ হাজার সিসি ক্যামেরা বসানো হয় গুলশান, বারিধারা, বনানী ও নিকেতন এলাকায়। অর্ধশত পয়েন্টে বসানো হয়েছে পুলিশি পাহারা। ১১টি পয়েন্টে বসেছে চেকপোস্ট। গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে টহল। এরই মধ্যে কূটনৈতিক জোনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়েছে ডিএমপি কূটনৈতিক নিরাপত্তা জোন। **প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা থেকে সড়কপথে কিশোরগঞ্জ জেলার দূরত্ব কমবে ৬০ কিলোমিটার

মহাসড়কে উন্নীত হচ্ছে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর কাপাসিয়া-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়ক। আর এ মহাসড়ক বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪৫ কোটি টাকা। এ মহাসড়ক বাস্তবায়ন হলে ঢাকা থেকে সড়কপথে কিশোরগঞ্জ জেলার দূরত্ব কমে আসবে অন্তত ৬০ কি.মি.। এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে এ অঞ্চলের মানুষের। রাজধানী ঢাকা থেকে গাজীপুর-মাওনা হয়ে ময়মনসিংহ দিয়ে এবং টঙ্গী থেকে নরসিংদী-ভৈরব হয়ে যেতে হতো কিশোরগঞ্জ। ঢাকা

থেকে সড়কপথে কিশোরগঞ্জের দূরত্ব কমিয়ে আনতে ২০০৫ সালে কাপাসিয়ার শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ফকির মজনু শাহ সেতু তৈরি করা হয়। পরে গাজীপুরের সীমান্ত কাপাসিয়ার টোক এলাকা দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মাণ করা হয় আরেকটি সেতু। আর এই দুই সেতুর কারণে ঢাকা থেকে সড়কপথে কিশোরগঞ্জের দূরত্ব কমে আসে প্রায় ৬০ কি.মি. কিন্তু ৪১ কি.মি. সরু খানাখন্দে ভরা রাস্তার কারণে এই সুবিধা ভোগ করতে পারছে না কিশোরগঞ্জসহ ওই রুটে চলাচলকারী লাখো মানুষ। আর এলক্ষ্যে গাজীপুর ও কিশোরগঞ্জের মধ্যে সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা আঞ্চলিক সড়ক-মহাসড়কের উন্নয়নের উদ্যোগ নেয় সরকার। সেজন্য ২৪৫ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে। আর এ মহাসড়কটি বাস্তবায়িত হলে কিশোরগঞ্জসহ পাশের জেলা ও এলাকার জনসাধারণের জীবনমান ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার ব্যাপক উন্নয়ন হবে।

প্রথম মেট্রোরেল ও বিআরটি বাস

ঢাকা মহানগরের পাশের জেলাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২৬ জুন ২০১৬ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ও মেট্রোরেল নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। ঢাকার যানজট নিরসনে প্রথমবারের মতো যোগ হচ্ছে মেট্রোরেল, যার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ জুন ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশের প্রথম মেট্রোরেল ও বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন – বাসস

পুরোটাই হবে উড়ালপথে। এতে স্টেশন থাকবে ১৬টি। এর দৈর্ঘ্য হবে ২০.১ কি.মি. (উত্তরা থেকে মতিঝিল)। প্রথম ধাপ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ২০১৯ সালে (উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত)।

দ্বিতীয় ধাপ চালু হবে ২০২০ সালে (আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত)। এছাড়া দেশের প্রথম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণে চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না গেজৌবা গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ চুক্তি স্বাক্ষর করে ১ ডিসেম্বর ২০১৬। এর দুই প্রান্তে থাকছে গাজীপুর ও শাহজালাল বিমানবন্দর (ঢাকা)। এর দৈর্ঘ্য হবে ২০.৫ কি.মি.। যার সমতলে ১৫ কি.মি. এবং উড়ালসড়ক ৪.৫ কি.মি. উত্তরা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত। মোট টার্মিনাল থাকবে ২টি, স্টেশন হবে ২৫টি।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশেষ বিধান রেখেই বাল্যবিয়ে বিল পাস

বিশেষ প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের বিয়ের বয়সে ছাড়ের বিধান রেখে 'বাল্যবিয়ে নিরোধ বিল ২০১৭' সংসদে পাস হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বিলটি উত্থাপন করলে কণ্ঠভোটে তা পাস হয়।

পাসকৃত বিলের বিশেষ বিধান সম্পর্কে বলা হয়, 'এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারীর সর্বোত্তম স্বার্থে আদালতের নির্দেশক্রমে এবং মাতা-পিতার সম্মতিক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে বিবাহ সম্পাদিত হলে তা এই আইনের অধীন অপরাধ বলে গণ্য হবে না'। এই আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স আগের মতো ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বহাল আছে।

বই পড়ে ১৩১৬ ছাত্রছাত্রী পুরস্কৃত

বছরজুড়ে বইপড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে নিজের উৎকর্ষের পরিচয় দেওয়ার জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি বরিশালে ১ হাজার ৩ শত ১৬ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দিয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও গ্রামীণ ফোন। বরিশাল নগরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬ সালে বরিশাল নগরের ৩১টি স্কুলের প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়। তাদের মধ্যে মূল্যায়নপর্বে যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে গ্রামীণফোনের সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তাদের পুরস্কার প্রদান করে।

উৎসবে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, একটি জাতি বড়ো হতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষা। তারপর বুদ্ধি, দেশপ্রেম, শক্তি ও সাহস। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিক্ষা। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বইগুলো থেকে শিশুরা সেই শিক্ষা পেতে পারে।

সুবিধাবঞ্চিত ৭ শিশু পেল পুরস্কার

শিশু-কিশোরদের সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ বাড়াতে ব্র্যাক আয়োজিত তারায় তারায় দীপশিখা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে পুরস্কার পেল ৭ সুবিধাবঞ্চিত শিশু। ১০ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরের মুক্ত মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্র্যাক প্রতিবছর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 'তারায় তারায় দীপশিখা' আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, হরিজন, বেদে ও যৌনপল্লির শিশুদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। নাচ, গান, আবৃত্তি ও ছবি আঁকা–এই চারটি বিষয়ে ছয় ক্যাটাগরিতে ৭ জনকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়। অঙ্কনে পুরস্কার পেয়েছে যশোরের ঐশী অধিকারী। গানে ক বিভাগে প্রথম হয়েছে সিলেটের শাহরিয়ার আহমেদ পান্না এবং খ বিভাগে প্রথম রাজশাহীর রেওয়ান হাসান। নাচে ক বিভাগে প্রথম রংপুরের মেধা রাণী বর্মণ এবং খ বিভাগে রংপুরের শিবসুন্দর বর্মণ। আবৃত্তিতে ক বিভাগে প্রথম কিশোরগঞ্জের তাসনিয়া ইসলাম এবং খ বিভাগে প্রথম ঢাকার তানিয়া আক্তার। অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম উপস্থিত ছিলেন। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোগ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের কাছে বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে বর্তমান সরকার । গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) নতুন পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ তথ্য জানান পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বিশেষায়িত শিল্প এলাকায় কলকারখানা স্থাপনের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। মন্ত্রী জানান, আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হবে এবং শিল্পকারখানার পাশাপাশি বসতবাড়ির চাহিদা মাফিক বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। তাছাড়া সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করছে।

জ্বালানি সাশ্রয়ী শিল্পায়ন পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার

বর্তমান সরকার পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী শিল্পায়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শতভাগ দূষণ ও দুর্ঘটনামুক্ত শিল্প স্থাপনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে শিল্প মন্ত্রণালয়। গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মিরপুরে এমআইএসটি মিলনায়তনে যন্ত্র প্রকৌশল এবং ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিএমএএস ২০১৭) উদ্‌বোধনকালীন এসব কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী আরো জানান, সবুজ শিল্পায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সুরক্ষায় কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে বর্তমান সরকার। দেশের শিল্পোদ্যোক্তারা যাতে সবুজ শিল্পায়নের প্রকৃত সুবিধা কাজে লাগাতে পারে– সে লক্ষ্যে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকায় ওষুধশিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতির উদ্যোগে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় ওষুধশিল্পের কাঁচামাল ও সরঞ্জামের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী 'নবম এশিয়া ফার্মা এক্সপো ২০১৭'। এ খাতের উদ্যোক্তারা জানান, বিশ্বের ১২৭টি দেশে বর্তমানে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশের ওষুধশিল্প এখন আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে। এসময় প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি

নবম এশিয়া ফার্মা এক্সপো ২০১৭-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের ওষুধশিল্প ২০৩৩ সাল পর্যন্ত মেধাস্বত্বে ছাড় পেয়েছে। তাছাড়া ওষুধশিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের দাবিকে তিনি যৌক্তিক হিসেবে উল্লেখ করেন। আর এ দাবি পূরণে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সূত্র মতে জানা যায়, আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিশ্বের ওষুধ বাণিজ্যের ১০ শতাংশ দখল করা সম্ভব। এতে ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে

বাংলাদেশে উৎপন্ন বিভিন্ন পাটজাত পণ্য

২০১৬–১৭ অর্থবছরের জুলাই–জানুয়ারি মেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ৫৬ কোটি ৩৯ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার বা ৪ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের বর্তমান সময় পর্যন্ত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ৮৭ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, গত ২০১৫–১৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসের তুলনায় এ খাতের পণ্য রপ্তানি আয় ১৪ দশমিক ০৫ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

আট বছরে ৪২ লাখ বাংলাদেশির বিদেশ গমন

বিগত আট বছরে ৪১ লাখ ৯০ হাজার ৩৮৯ জন বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি। ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

২০১৬ সালে কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশ থেকে ৭ লাখ ৫৭ হাজার ৭৩১ জন পুরুষ ও ১ লাখ ১৮ হাজার ৮৮ জন নারী কর্মী বিদেশ গেছেন। তিনি আরো জানান, বিগত জোট সরকারের আমলে যেখানে বিশ্বের মাত্র ৯৭টি দেশে কর্মী পাঠানো হতো সেখানে নতুন করে আরো ৬৫টি দেশে কর্মী প্রেরণসহ বর্তমানে ১৬২টি দেশে কর্মী পাঠানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে রাশিয়া ও থাইল্যান্ডে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

নতুন বৈশ্বিক বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর

ট্রেড ফ্যাসিলেশন এগ্রিমেন্ট (টিএফএ) নামের নতুন এক বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১১২টি দেশ এই চুক্তি অনুমোদন দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, টিএফএ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ব্যয় কমবে। আমদানি-রপ্তানিতে বিশ্বব্যাপী লালফিতার দৌরাত্ম্য যেমন কমবে তেমনি বাণিজ্য সহজতর হবে। সংস্থাটি মনে করছে, এই চুক্তি কার্যকর

হলে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর নতুন পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য এ চুক্তি আশীর্বাদ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ চুক্তির ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি আসবে। আমদানি-রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় নথি কম্পিউটারাইজড হওয়ার ফলে তাতে সবার প্রবেশাধিকার থাকবে। সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে। এতে রপ্তানিকারকদের বাধা দূর হবে। সহজ হবে আমদানি কার্যক্রম।

কসোভোকে স্বীকৃতি দিল বাংলাদেশ

২০০৮ সালে স্বাধীন হওয়া কসোভোকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ২৭ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে কসোভোকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। সংবাদ ব্রিফিং-এ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

মন্ত্রিপরিষদ এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিষয়টি কসোভোকে জানিয়ে দেওয়া হবে। বাংলাদেশ হবে ১১৪তম স্বীকৃতি দানকারী দেশ।

মালয়েশিয়ায় ই-কার্ড প্রদান, দুই লাখ বাংলাদেশি বৈধতা পাবে

মালয়েশিয়ায় চলমান 'রি-হায়ারিং' কর্মসূচির আওতায় দুই লাখের বেশি অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীর বৈধতা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বৈধতা পেতে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে অস্থায়ী পাস (ই-কার্ড) গ্রহণ করতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী অবৈধ কাগজপত্রহীন সকল বিদেশি শ্রমিককে বৈধতার আওতায় আনতে এ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাবেদ আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১ লাখ ৮৮ হাজার বাংলাদেশি কর্মী ই-কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন। ই-কার্ড পেলে তারা ২০১৭ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত বৈধভাবে মালয়েশিয়ায় কাজ করার সুযোগ পাবেন।

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎসব

নিউইয়র্কের ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎসব। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হস্তশিল্প সামগ্রীসহ অন্যান্য উপাদান দিয়ে সজ্জিত দোকানে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খাবার, সমুচা, সিঙ্গাড়া ও পাকোড়া স্থান পায়। বিদেশি

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎসবে বাংলাদেশের স্টল

অতিথিরা বাংলাদেশের খাবারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। উৎসবে বাংলাদেশের কনস্যুলেটর কনসাল জেনারেল মো. শামীম আহসান এনডিসি এবং তাঁর সহধর্মিণী পেন্ডোরা চৌধুরীসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নিউইয়র্কভিত্তিক বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা)-এর শিল্পীদের অনবদ্য পরিবেশনাও বিদেশি দর্শকদের অভিভূত করে। **প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন**

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল-এ চ্যাম্পিয়ন কক্সবাজার ও লালমনিরহাট

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা প্রাথমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬-তে মোট ২৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় অংশ নেয়। নারী ও পুরুষ বিভাগের এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট ২১ লাখ ৮৩ হাজার ৭৫২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এই সুবিশাল অংশগ্রহণকারীর দিক থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয় ইউনিয়ন পর্যায়ে। এরপর উপজেলা, জেলা, বিভাগ হয়ে জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয় ২২ ফেব্রুয়ারি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ মার্চ ২০১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬-এর চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন –পিআইডি

২০১৬। সাতটি বিভাগে ১৪টি চ্যাম্পিয়ন দল চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে। ২ মার্চ ২০১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বালক ও বালিকা বিভাগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বালক বিভাগের ফাইনালে কক্সবাজারের টেটং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বনাম সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার কামরান্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কক্সবাজারের টেটং প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বালিকা বিভাগে ফাইনালে রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার টেপুরগাড়ি বি কে বিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ ছিল রাজশাহীর চারঘাটের বড়বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ন হয় পাটগ্রাম উপজেলার টেপুরগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাঠে উপস্থিত থেকে দুটি খেলা উপভোগ করেন এবং চ্যাম্পিয়ন ও বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ী খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

পদ্মার চরে ক্রীড়াপল্লি তৈরির আশ্বাস

রোল বল বিশ্বকাপ সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের সাফল্যের এবং স্বপ্নের পদ্মা সেতু তৈরি হচ্ছে, সেই পদ্মার চরেই উন্নত মানের ক্রীড়াপল্লি হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশীয় খেলোয়াড়রা যেখানে যে বিভাগে খেলেন সেখানে ছুটে যান এবং তাদের সাফল্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা করেন। রোল বলে বাংলাদেশ পুরুষ দলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। গতবার অবস্থান ছিল ৭ম। এবারে চতুর্থ হলেও অনেক ভালো খেলেছেন। প্রতিযোগিতায় মোট ৩৯টি দেশ ও সর্বোচ্চ ৬২৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের নামফলক উন্মোচন করেন। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**